উৎস মানুষ

৪৪তম বর্ষ • ২য় সংখ্যা • এপ্রিল-জুন ২০২৪

সূচিপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
আমাদের কথা		
হাত দেখানো	দীপ্তেন্দ্রকুমার সান্যাল	২
রাসমণির মন্দির ও রামকৃষ্ণ	নিরঞ্জন ধর	৫
আত্মা পরমাত্মা	নিশীথ চৌধুরী	১১
সময় কারও যে নাই	আশীষ লাহিড়ী	১২
যন্ত্র ডাক্তার	গৌতম মিস্ত্রী	১৪
বাড়ি থেকে পালিয়ে	অরুণালোক ভট্টাচার্য্য	১৬
রবীন মজুমদার	শঙ্কর ঘটক	১৯
ঘরের চাবি পরের হাতে	জিতেন নন্দী	২০
জাতীয় শিক্ষানীতি	কৃষ্ণপূজারি চট্টোপাধ্যায়	২৩
পাঠকের মতামত		২৫
নগর কৃষি	শ্রবণা মজুমদার	২৬
হিমবাহের গলন	শান্তনু গুপ্ত	২৮
গ্রন্থ পরিচিতি	শঙ্কর ঘটক	৩০

রেজিস্টার্ড অফিস : বি ডি ৪৯৪ সল্টলেক, কলকাতা- ৬৪

কার্যালয় ঃ খাদিমস বিদ্যাকুট আবাসন বি ৪, এস - ৩, পোঃ- (আর) গোপালপুর নারায়ণপুর কলকাতা- ৭০০১৩৬

ফোন : ৯৮৩০৬৫৯০৫৮/৮৯০২৪১২২৯০/৮৭৭৭০৬৬৪৭২

ওয়েবসাইট:www.utsomanush.com/

ই-মেল: utsamanush1980@gmail.com

ফেসবুক:http://www.facebook.com/utsomanush/

ISSN 0971-5800/RN.37375/80

আমাদের কথা

৪৭তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা চলাকালীন জানুয়ারি-মার্চ ২০২৪ সংখ্যাটি শেষ হয়ে গিয়েছিল। পত্রিকা না পেয়ে অনেকেই বলেছেন—একটু বেশি করে ছাপতে পারতেন। হ্যাঁ, তা পারতাম যদি আগের সংখ্যাগুলো নিয়ে তেমন অভিজ্ঞতা হত। দেরিতে হলেও এপ্রিলের গোড়াতেই জানুয়ারি-মার্চ সংখ্যাটি ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। বইমেলায় উৎস মানুষ-এর স্টলে ভিড় লেগে ছিল এমন নয়, তবে আমাদের প্রকাশিত বইয়ের বিক্রি মন্দ হয় নি। প্রতিবারের মতো বইমেলায় বেশ কয়েকটি স্টল থেকে উৎস মানুষ প্রকাশনার বই বিক্রি হয়েছে। বইমেলার খরচ বেড়েই চলেছে। এরকম চলতে থাকলে আমাদের বইমেলায় অংশ নেওয়া অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। বইমেলার পরেই আমাদের কয়েকটি বই নিঃশেষিত হয়। আশা করি সেগুলি পুনঃপ্রকাশিত হবে। অতিমারির পর থেকে ছাপাখানার খরচ এক লাফে অনেকটাই বেড়ে গেছে। এখন বইয়ের দাম যথাসম্ভব কম রাখাটাও মস্ত চ্যালেঞ্জ। এবারের বইমেলায় সমাজকর্মী বোলান গঙ্গোপাধ্যায়ের 'জল-জমি-জঙ্গলের খোঁজে' বইটি প্রকাশিত হয়েছে।

সদ্য হয়ে যাওয়া শিবরাত্রির দিন এই কলকাতার বুকে মাথায় ফেট্টি বেঁধে একদল উন্মাদ বিভিন্ন এলাকায় মিছিল করল। রামনবমীতে আরো লম্বা মিছিল বেরোবে তা বেশ জোর দিয়েই বলা যায়। লোকসভা নির্বাচনের আগে থেকে বেশ কয়েকটি স্কুল প্রায় বন্ধ। নিরাপত্তারক্ষীদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। লেখাপড়া ডকে উঠেছে। স্কুল-পড়ুয়াদের এ ক্ষতি অপূরণীয়। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম লেখাপড়া শিখুক তা বোধহয় বুলি-সর্বস্ব রাজনৈতিক নেতারা চাইছেন না। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে মোবাইল ফোন কেড়ে নেওয়ার ঘটনা নিয়ে ক'দিন বেশ গরম হল। এরই পাশাপাশি আমরা দেখি ব্রিটেন, সুইডেন ও ফ্রান্সে ছাত্র-ছাত্রীদের মোবাইল ফোন নিয়ে স্কুলে ঢোকার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে। এখানে কবে তা হবে জানা নেই।

চারিদিকে যুদ্ধ—রাশিয়া ও ইউক্রেন, প্যালেস্টাইন ও ইজরায়েল। নিরীহ মানুষদের যথেচ্ছ হত্যা, শিশুদের ছাড় নেই। অনাহারক্লিষ্ট মানুষকে নির্বিচারে মেরে যুদ্ধ জয়ের গর্বে উল্লাস করছে মহাপরাক্রমশালী দেশের যুদ্ধবাজ শাসক। যুদ্ধে পরিবেশের যে ক্ষতি তা নিয়ে তাদের মাথা ব্যথা নেই।

সম্প্রতি কলকাতা পৌর এলাকার কয়েকটি জায়গায় দৈনিক জলের ব্যবহার নিয়ে একটি সংস্থা সমীক্ষা চালিয়ে যে রিপোর্ট দিয়েছে তা বেশ উদ্বেগজনক। কোনো কোনো এলাকায়, বিশেষ করে যেখানে বহুতলের সংখ্যা বেশি, জনপিছু দৈনিক জলের খরচ প্রায় ৩০০ লিটার, যেখানে জাতীয় গড় ধরা হয় জন পিছু ৬৫ লিটার। ঢাকুরিয়া লেকের জলস্তর নেমে যাওয়া, পূর্ব কলকাতা জলাভূমি ভরাট করে আবাসন নির্মাণ এসব খবরগুলো ভয় ধরিয়ে দেয়। দেখেশুনে মনে হয় স্থায়ী সমাধান বহু দূর।

বেঙ্গালুরুতে তীব্র জলসঙ্কট। ব্যবহৃত জল পুনর্ব্যবহার করা, বৃষ্টির জল ধরে রাখা এসব দ্রুত চালু না হলে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া যাবে না। নদী থেকে যথেচ্ছ বালি তোলা, পরিশোধন না করে

নদীতে নোংরা জল ফেলা এসবও চলছে। সাম্প্রতিক একটি সমীক্ষায় জানা গেল হলদিয়ার কারখানার বর্জ্য সরাসরি নদীতে পড়ে যে দূষণ হচ্ছে, তার ফল ভুগতে হচ্ছে মৎস্যজীবীদের। মাছ কমেছে, যেটুকু আছে তাতে দূষিত জলের বিষ। খাওয়ার অযোগ্য। মৎস্যজীবীরা জীবিকা হারিয়ে সস্তার শ্রমিকে পরিণত হচ্ছেন। ভূগর্ভস্থ জলভাণ্ডার যথেচ্ছ ব্যবহারের ফলে বারাণসীর বিখ্যাত ঘাটগুলো বসে যাচ্ছে। পরিবেশ বিজ্ঞানীদের সতর্কতাই সার। বিপদ ঘণ্টার আওয়াজ কানে ঢুকছে না। তাহলে কী ধরে নেব যে যা খুশি করুক তাতে (পড়ুন সরকারের) কিছু আসে যায় না।

জলের সঞ্চয়, অপচয় ও ব্যবহার নিয়ে আমাদের সীমাহীন অজ্ঞতা ও উদাসীনতা যতই থাকুক না কেন, মুনাফাবাজ ও ফাটকাবাজরা বাজারটা যে শাঁসালো তা ধরে ফেলেছে। ওয়াল স্ট্রিটে (আমেরিকার শেয়ার বাজার) জল নিয়ে ভবিষ্যতের কেনাবেচা পাক্কা।

১৭ মার্চ, ২০২৪ দিনটি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। একসময় নবদ্বীপ সেন রাজবংশের শাসক লক্ষণ সেনের রাজধানী ছিল। তাছাড়া মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের জন্মস্থান, রয়েছে বেশ কয়েকটি প্রাচীন মন্দির। বিদ্যাচর্চার জন্য দেশজোড়া খ্যাতি ছিল নবদ্বীপের। বলা হত 'দ্য অক্সফোর্ড অফ বেঙ্গল'। এসবের টানে সারা বছর বিপুল সংখ্যক তীর্থযাত্রীর ভিড় লেগেই থাকে ঐতিহ্যবাহী এই প্রাচীন শহরে। সেখানে গত ১৭ মার্চ এক অভিনব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে ছিল ব্যানার, তাতে লেখা 'আমরা ঈশ্বরের অস্তিত্বের দাবিকে অস্বীকার করি'। নবদ্বীপে রাজ্যের প্রথম নাস্তিক সম্মেলনের উদ্যোক্তা 'নাস্তিক মঞ্চ' স্রোতের বিপরীতে এই সম্মেলন আয়োজন করে ইতিহাসে ঠাঁই পেয়ে গেল। উদ্যোক্তা ও অংশগ্রহণকারীদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

উৎস মানুষ প্রকাশনার সঙ্কলনগুলো মূলত বিষয়ভিত্তিক। ফলে পত্রিকার অনেক মূল্যবান লেখা গ্রন্থভুক্ত হয়নি। আমরা প্রতি সংখ্যায় সেইসব লেখা একে একে প্রকাশ করব বলে করছি।

উমা

আহরণ

হাত দেখানোর হাত থেকে

দীপেন্দ্রকুমার সান্যাল
(১৯২৪- ১৯৬৬)

তৎকালীন অচলপত্র নামক অত্যন্ত জনপ্রিয় বাংলা মাসিক পত্রিকার জন্য অধিক পরিচিত ছিলেন। শৈশব থেকেই তাঁর লেখালেখিতেই আগ্রহ ছিল। কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি নিজেকে স্পষ্টবক্তা হিসাবেও প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে বহু আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা যখন অনেকেরই প্রত্যাশা মেটাতে ব্যর্থ হয়, অখণ্ড ভারতে খণ্ডিত পরিণাম যখন দুর্গতিতে পরিণত হল, সাহিত্যমোদী দীপেন্দ্রকুমার চাকরির খোঁজ বা ব্যবসার কোনো প্রচেষ্টা না করে, ব্যঙ্গের মাধ্যমে সামাজিক, পারিপার্শ্বিক নানা অসঙ্গতি আর নিজের চিন্তাধারা প্রকাশের জন্য অচলপত্র পত্রিকা প্রকাশের পরিকল্পনা করেন। পত্রিকাটি সম্পর্কে তিনি বিজ্ঞাপনে লেখেন—'অচলপত্র বড়দের পড়বার এবং ছেলেদের দুধ গরম করবার একমাত্র মাসিক।' অকুতোভয় মতপ্রকাশ আর কঠোর লেখনীর ধারার জন্য তিনি অপ্রিয় হয়েছেন অনেক ক্ষেত্রে। আর সে কারণেই পত্রিকাটির জনপ্রিয়তা অচিরেই বৃদ্ধি পায়।

একমাত্র পুলিশ ছাড়া আর প্রায় সবাই হাত দেখায় নিজের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ জানবার জন্যে। পুলিশ হাত দেখায় যাতে গাড়ীর তলায় আপনার ভবিষ্যৎ সংক্ষিপ্ত হয়ে না আসে হঠাৎ (কিংবা এদেশে পুলিশ হাত দেখায় একসিডেন্ট বাধাবার জন্যই)। আর? আর ব্যতিক্রম হলো যুদ্ধে কি বাজীতে কি ঐ পুলিশ ঠিক সময়ে হাত না দেখানোর ফলে (পাশেই কোথাও সুন্দরী পানউলী পান বেচতে থাকলে নাকি এরকম হয় শুনেছি!)। যাদের একসিডেন্টে দু-হাতেই কাটা গেছে তারাও হাত দেখানোর হাত থেকে বঞ্চিত। আগে আমার সমবেদনা হতো কাটা হাত লোক দেখলে, মনে হতো একে ত আমাদের চার পা নয় (সকলেরই নয় কি?) তারপর আবার যেসব হতভাগ্য দু-হাত থেকে বঞ্চিত তাদের কী দুঃখ। কিন্তু না দুঃখ নয়, এখন আনন্দ হয় এই জেনে যে এরা পৃথিবীর সেই মুষ্টিমেয় সৌভাগ্যশালীদের অন্যতম, যাদের কোনো ইহকাল পরকাল বলে দেওয়া জ্যোতিষীর কাছে হাত পাততে হয় না (ভাগ্যিস জানোয়ারদের হাত নেই, না হলে তাদেরও জ্যোতিষী-গণনার হাত থেকে অব্যাহতি ছিল না! মানুষ কি জানোয়ারের চেয়ে অধম?)

হাত দেখানোর চেয়ে বড় ট্র্যাজিডী বাস্তবিকই আর নেই। এমনকি 'পেডিকিওর' করবার জন্যে পা দেখানোও তার চেয়ে কম দুঃসহ। আর সবচেয়ে মজা হলো এই, যে দু-হাত নেড়ে আপনাকে বলবে 'ওসব হাত দেখ-টেখানোতে আমি বিশ্বাস করিনে,' সবচেয়ে আগে এ্যমেচার কি প্রফেশনাল কিংবা রাস্তায় চক দিয়ে কেটে বসা দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন আধুনিক ভৃগুর কাছে হাত বাড়িয়ে বসে থাকে তারাই। যদি তাকে চেপে ধরেন ত উত্তর সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পাবেন। বিশ্বাস নেই তবে বাজিয়ে দেখতে দোষ কি লোকটাকে। বাজিয়ে দেখার আগে সে যে হাত দেখানোয় অবিশ্বাসীর বারটা বাজিয়ে ছেড়ে দেবে সেকথা তখন তাকে বলে কে। বললেই বা শোনে কে? শুনলেই বা কানে ঢোকে কার? কানে ঢুকলেই সেইমত কাজ করা সম্ভব হয় কি করে? কারণ উপদেশমত কাজ করা সম্ভব হলে ত আরম্ভে অত আস্ফালন করে (পাকিস্তানের ব্যাপারে কংগ্রেসী আস্ফালনের মত) তারপর হাতবাড়ান ব্যাপারটা অসম্ভবই হয় ঠিকই। কিউরিওসিটি কথাটা কেন যে মেয়েদের

চরিত্রেই প্রক্ষেপ করা হয় আমি ভেবে পাইনে। নিজের ভবিষ্যৎ জানার জন্যে বেটাছেলের অনুসন্ধিৎসা কি মেয়েদের 'কি দিয়ে আজ ভাত খেলিরে' জানার চেয়ে কম হাস্যকর? গ্রহচক্রে কোন গ্রহ সরে কোথায় আসছে, কার খারাপ দশা আর কে বক্রী শনির ঠেলায় গুঁতো খাচ্ছে। কার গুরুচণ্ডালী দোষ আছে জন্মপত্রে, যার জন্যে লক্ষ লক্ষাধিক হওয়ার পরেই কারাবাস কার নিশ্চিত; হাতের তেলোতে পতাকা দেখা দেওয়া মাত্রই কারুর পৌষ মাস; আবার কার হাতে সার্কল দেখা দেওয়া মাত্র সর্বনাশ, আমার আত্মীয়-স্বজন এবং আপনাদেরও নিশ্চয়, অনেকেরই এই নিয়ে দিন কাটে, রাত বাড়ে।

রেসের টিপস্ থেকে ফাটকার বাজার, রাজায় রাজায় যুদ্ধ যাতে উলুখাগড়ার প্রাণ যায় সবই কিন্তু নির্ভর করছে আপনার বক্রী শনি কি তুঙ্গী শনি তার ওপর। অবশ্য সান্ত্বনারও অভাব নেই, আপনার এখন মানসিক অশান্তি গেলেও আপনার স্ত্রীর এখন ভাল। রাশিগত বিচারে যদি আপনার এ-সপ্তাহে ব্যয় বেশী হয় ত লগ্ন বিচারে এ সপ্তাহে আপনার আয় প্রচুর। লোহার ব্যবসায় লোকসান হলেও ঘুঁটের ব্যবসাতে আপনার বাজী মেরে দেওয়ায় বাধা নেই। যদিও নিশ্চিত মৃত্যু আপনার শিয়রে, তবুও তা কাটাবার বন্দোবস্তও আছে। সবই নাকি কপালে হচ্ছে। নলিনী সরকার যে ফুটপাত থেকে রঞ্জনীতে আর আপনি ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডাইরক্টরের পদ থেকে এখন জেলে তার কারণ আপনার কপালে গুরুচণ্ডালী দোষ। সরকারের কপালে একাদশে বৃহস্পতি। এমনকি আপনার সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী যদি প্রত্যেকটাই মিথ্যে হয় তাহলে বুঝতে হবে আপনারই জন্ম সময়ের ঠিক নেই (ভাগ্যিস জন্মের ঠিক নেই শুনতে হয় না!) অর্থাৎ সন্ধি মুহূর্তে জন্মাবার ফলে এক মিনিট এদিক ওদিক হয়ে যাওয়ায় আপনার রাজা হওয়ার কথা কিন্তু আপনি বড়জোর হতে পারলেন 'রাজা নামক বাসের কন্ডাক্টর। জ্যোতিষীদের বিপর্যয় কম নয়। ব্যবসা যদি করতে হয় তাহলে তাদের লিখতে হবেই 'জাতক বুদ্ধিমান এবং প্রচুর সৌভাগ্যসম্পন্ন, তবে—' এই তবেটুকু মুছতেই আপনার অর্ডিন্যারি খরচা সাড়ে বার টাকা—স্পেশাল খরচা পঁচিশ টাকা। পূর্ব থেকে নির্দিষ্ট আপনার কর্মফলের প্রতিক্রিয়া সমস্ত মুছে দিতে পারে একটি কবচ। আর তা না বলে যদি জ্যোতিষী আপনাকে বলে যে পৃথিবীর কোটি কোটি সাধারণ লোকের মত আপনিও সাধারণ ভাগ্য নিয়ে জন্মেছেন, চেষ্টা করেই আপনাকে বড় হতে হবে, যদি একান্তই বড় হওয়া আপনার বাসনা। তাহলে আপনি গুণ্ডা হলে তাকে মারবেন, শান্ত প্রকৃতির হলে বলবেন লোকটা বাজে বলল। সত্যিই তার ওপর ভরসা করে বউ-এর গয়না বেচে আপনি আট নম্বর ঘোড়ার ওপর সব টাকা ধরে, পরের দিন পাঁচটা টাকার জন্যে সেই জ্যোতিষীর কাছেই হয়ত হাত পেতেছেন (এবারে আর রেসের টিপসের জন্য নয় অবশ্যই)। আপনি আমি, সে সর্বনামের মধ্যম উত্তম অধম সমস্ত অধমর্ণ এবং উত্তমর্ণেরাই হাত দেখানোর ওপর তবুও বিশ্বাস রাখেন, কেউ বাইরে, কেউ ভেতরে, তবে একটা কথা ঠিকই হাত দেখানোর মত হাতে হাতে আর কিছু ফলে বা বিফলে না। তবুও আশা যেমন কখনো ফুরোয়নি তেমনি হাত দেখানোও হাতে হাতে ঘুরতে থাকে।

হাত দেখা জানা থাকলে আপনার কিছু হাতাতেই বাধা নেই। পুরুষ মানুষের পকেট কী মেয়েমানুষের মন (মেয়েদের মনও অবশ্য অনেক ক্ষেত্রেই পুরুষদের পকেটেই থাকে।) আপনি ভাল লেখক কি উদ্ভট ছবি আঁকিয়ে কিংবা বাচ্চা পঙ্কজ মল্লিক, আপনি যাই হোন না কেন, আপনি তরুণী-চিত্তহারী তেমন নন, যেমন নাকি একজন এ্যামেচার জ্যোতিষ জমিদার (এই রকম টাইটেল জ্যোতিষীদের হয় কি না!) আর তা ছাড়া হাত দেখাবার নাম করে একটি সুন্দরী মেয়ের হাত যেই আপনার হাতে গ্রহণ করলেন পাণিগ্রহণ হয়ে গেল সেখানেই। মেয়েরা নিজেদের সম্বন্ধে কিছুই প্রায়ই জানতে চায় না—স্বামীভাগ্য কেমন দৃষ্ট হচ্ছে তাদের হাত এইটেই একমাত্র জানবার। অবশ্য আমাদের দেশে এখনো বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই মেয়েরা কেরিয়ার করতে বেরোয় না। কাজেই মেয়ের মা-দের কাছে জ্যোতিষীদের শুধু এইটুকু বলতে হবে; আই-সি-এস জামাই হবে আপনার। দশ বছর আগেও আই-সি-এস জামাই বললে মেয়ের মা খুসী হতেন। যে জ্যোতিষী ভারতবর্ষে পলিটিক্যাল চেঞ্জের খবর না রেখে এখনো বলে আই-সি-এস জামাই-এর কথা, সে ভেবে অবাক হয় মেয়ের মায়ের মুখ তাতে আরো শুকিয়ে গেল কেন। আই-সি-এসদের দিন চলে গেছে। লোকে যে তাদের দেখে বলে I See Ass! —এ খবর গরীব ব্রাহ্মণ কোথা থেকে রাখবে? তবে জ্যোতিষের সব টেষ্ট মেয়েদের ক্ষেত্রেই; অন্তত আমার কাছে ত তাইই। কোন জ্যোতিষী কোন মেয়ের আসল বয়স (যা ভগবানও জানেন না) বলতে পারবে হাত দেখে, সেদিন বলব হ্যাঁ।—বিনয় সরকারের ভাষায় বাপকা বেটা।

কিন্তু সত্যিই ভবিষ্যৎ জেনে বা কতটুকু লাভ? যদি হিন্দু শাস্ত্র মতে বিশ্বাসই করতে হবে যে নিয়তি কেন বাধ্যতে তাহলে ভবিষ্যৎ জানবার জন্যে এ-আগ্রহ কেন? আর যা ঘটবার তা

যখন ঘটবেই, যদি জ্যোতিষীদের মতে তা পাল্টাবার আর কোনো চান্স নেই তখন এ-হা হুতাশ কেন? এবং আমার নিজের অনেক সময়ই মনে হয় আমরা বেশীরভাগ লোকই অত্যন্ত দুর্বল মানসিক শক্তিতে, কেউ যদি ফস করে খারাপ একটা কথা বলে দেয়, যদি বলে অমুক দিন আপনার পা খানায় পড়ে খোঁড়া হবে, তা মনে মনে আমরা খোঁড়া হয়ে রইলাম কিন্তু তার সাত দিন আগে থেকেই। আবার জ্যোতিষী যদি রসিকতা করে বলে একটা মাটির তলার কালো জিনিশ নিয়ে যদি ব্যবসা করেন তবে এ-সময়ে তুঙ্গী শনির কৃপায় আপনার লাভ মারে কে? আপনি গো-শাস্ত্র সম্বন্ধে ট্রেনিংপ্রাপ্ত, আপনি ব্যবসা করতে গেলেন কয়লার এবং জলে দিলেন লাখ কয়েক টাকা—অবশ্য বাপের টাকা এবং কয়লা সেই চাঁদের কলঙ্ক, যা কখনো ঘোচবার নয়, দেব ভাষায় যাকে বলে অঙ্গারঃ শত ধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি। শুধুমাত্র হাত দেখানোর ফলে কত লোক যে নিজের মাথা কেটেছে তার ইয়ত্তা নেই। মজা হচ্ছে হাত দেখানোয় যার ভবিষ্যদ্বাণী না ফললেও বোঝাতে বিশেষ অসুবিধা হয় না জ্যোতিষীদের যে, আমাদেরই দোষে ফলেনি, আমরাই ঠিকমত date দিতে পারিনি। আমি জানি আমার বন্ধু যাকে জ্যোতিষী বললে: দ্বিতীয় প্রচেষ্টা তার অভূতপূর্ব সফলতা লাভ করবে। আমার সেই বন্ধুটি পুস্তক প্রকাশক। তার প্রথম বইটি কোনো জ্যোতিষ গণনা না করিয়েই ভীষণ বিক্রী হয়। এই দ্বিতীয় বইটি তেমন চলল না। জ্যোতিষী অবশ্য একদিন আমার সামনেই তাকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিল যে দ্বিতীয় বইটিও বাজারের তুলনায় বেশ চলেছে। বুঝিয়ে প্রায় এনেছিল, কিন্তু তখনই কোন বইয়ের দোকান থেকে যেন চিঠি এল, যে বই জমা দিয়ে গেছ তা একখানিও বিক্রী হয়নি, কাজেই ফেরৎ নেওয়ার বন্দোবস্ত করো। জায়গার বড় অভাব গুদামে, সেইজন্যই নাকি এই অনুরোধ না হলে ...ইত্যাদি। যাক, আমি ভাবলাম এবারে প্রকাশক বন্ধুর জ্যোতিষ-প্রেম বোধ হয় কমল। কিন্তু না,—কিছুদিন বাদে সেই বন্ধুটি আমাকে বলল: জ্যোতিষী ত মিথ্যে বলেনি ভাই। আমরাই ভুল করেছি। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: কী রকম? 'কেন?'—উত্তর এল, 'বুঝলে না?' বন্ধু সগর্বে বলেন। 'আমরা যে বইটি আসলে দ্বিতীয় বই করে বাজারে ছাড়বো ঠিক করেছিলাম, সে বই ত দ্বিতীয় বই হয়ে বেরোয়নি, অন্য বই তার আগেই আমরা বাজারে ছেড়েছি আগে ছাপা হয়ে গেছল বলে, কাজেই তৃতীয় প্রকাশ হওয়ায় বাজার পায়নি ভাল। আশী বছরে কাদের যেন বুদ্ধি হয় একদা শুনেছিলাম, আমার এই বন্ধুটির আশিতেও যদি সেই বুদ্ধি হয় ত বুঝব ভগবানের আশীর্বাদ আর জ্যোতিষীর মারের ফলেই তা হয়েছে। আরেকজন প্রায় প্রবীণ খ্যাতনামা একজনের কাছে শুনেছি এক জ্যোতিষী তাঁর সম্বন্ধে অনেক কথা বলে। কিন্তু ভদ্রলোকের সন্দেহ হয় যে জ্যোতিষী আগে থেকেই তার সম্বন্ধে খবর জানত, অতএব তিনি তাঁর ভাগ্নীকে নিয়ে যান সঙ্গে এবং কোনো পরিচয় দেন না তার। এবারে জ্যোতিষ মহাপ্রভু ভাগ্নীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে দু-একটি কথা ছাড়া বিশেষ কিছু বলতে পারলেন না কারণ মুডের অভাব। আর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে এদেশে এক ডাক্তার ছাড়া আর প্রায় সবাই কিছু বলতে পারে।

কিন্তু তবুও জ্যোতিষশাস্ত্র মিথ্যে নয়। প্রচুর ভেজাল মেশাবার পরেও কোনো কোনো লোকের ভৃগুর যা ভবিষ্যদ্বাণী থাকে তা মেলে অসম্ভব ভাবে। এমনকি মুখ দেখে, হাত দেখেও অনেক সময় অনেক লোকই অনেকের সম্বন্ধে অনেক কিছুই না জেনে অনেক কিছু সত্যি বলে দেয়। তখন আপনার পিলে চমকায়, মুখ চোখ লাল হয়ে যায় (কেন বুঝতেই পারছেন) বুক ধড়ফড় করে, এবং প্রাণমন ছটফট করতে থাকে। কাজেই শাস্ত্র মিথ্যে নয়। যারা শাস্ত্র না দেখে ব্যবসা করে তারাই ধাপ্পা দেয় বেশীরভাগ সময়েই। কিন্তু জ্যোতিষশাস্ত্র ছেলের হাতের মোয়া নয়, জহরলালের ডিসকভারী অব্ ইন্ডিয়া নয়, ম্যাজিক নয় যে প্রচুর ভুল করলেও তা শোধরানো সম্ভব। এতটুকু এদিক ওদিক হলে ইন্টারপ্রিটেশনে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। দৃষ্টিপাত আর শীতে উপেক্ষিতার ব্যবধান। জ্যোতিষশাস্ত্র সেই পারদর্শী হতে পারে যার ম্যাথামেটিক্যাল ব্রেণ পরিষ্কার। অত্যন্ত লজিক্যাল এবং র‍্যাশনাল না হলে জ্যোতিষ-বাণীর পাঠোদ্ধার করা শক্ত। শুভ সময় আবার নিজামের পক্ষে যা বোঝায় কয়লাঘাটা স্ট্রীটের কোনো কেরাণীর ক্ষেত্রে নিশ্চয় তা বোঝায় না। 'হঠাৎ অর্থপ্রাপ্তি' বলতে আগা খাঁর ক্ষেত্রে যা বোঝাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইকেল পিওনের বেলায় কিন্তু অর্থের পরিমাণ তা নয়। পারিপার্শ্বিক, ব্যক্তিগত অকথা না জানলে ভাল করে বিচার না করে বললে উল্টো বুঝলি রাম হয়ে যায় অনেক ক্ষেত্রেই। এ্যষ্ট্রনমীর ওপর দখল থাকা এষ্ট্রলজী চর্চার পক্ষে অপরিহার্য বললেই চলে। অশিক্ষিত পটুত্ব বড় পরিবারের ছেলের ছবি আঁকার ব্যাপারের একমাত্র এক্সপ্ল্যানেশন হলেও জ্যোতিষচর্চার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য। বহুদিনের বহু অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও জ্যোতিষ গণনা কেন ব্যর্থ হয় তার প্রধান কারণই হলো সায়েন্টিফিক ট্রেনিং-এর অভাব। **(২য় পর্ব পরবর্তী সংখ্যায়)**

উমা

পুরনো সংখ্যা থেকে জুন, ১৯৯১

পুরোহিত থেকে অবতার/ পর্যায় ১

রাসমণির মন্দির ও রামকৃষ্ণ

নিরঞ্জন ধর

গদাধর এক অতি দরিদ্র পুরোহিত বংশের সন্তান এবং নিজেও ছিলেন রাসমণি-প্রতিষ্ঠিত এক মন্দিরের নগণ্য পুরোহিত। যে চালকলাবাঁধা বিদ্যা সম্পর্কে তিনি একদা গভীর অনীহা প্রকাশ করেছিলেন, অল্পকাল পরেই সেই বিদ্যাকে সম্বল করেই তিনি সংসার সমুদ্রে পাড়ি জমাতে উদ্যত হয়েছিলেন। কালক্রমে সেই পুরোহিত গদাধরের গুণগত উত্তরণ ঘটল এবং আজ একজন অবতারবরিষ্ঠ হিসেবে দেশের ও বিদেশের বহু গৃহে পূজিত হচ্ছেন।

যেহেতু গদাধরের অবতার রামকৃষ্ণে উত্তরণ ঘটেছিল মধ্য-কলকাতার জানবাজার জমিদার পরিবারের ছত্রচ্ছায়ায় সেহেতু এই উত্তরণের চাবিকাঠিটি আমাদের খুঁজতে হবে প্রধানত উক্ত পরিবারের নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে। ঐ পরিবার ছিল জাতিতে জেলে-কৈবর্ত অর্থাৎ জল-অনাচরণীয় শূদ্র। এখন দেখা গেছে যে, জাতপাতের কাঠামোয় নিচের দিকে যে-সব জাতের অবস্থান তারা সাধারণত ওপরতলার জাতসমূহের অনুকরণ করে নিজেদের জাতোন্নয়নের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু সেই সঙ্গে আবার আমরা দেখি, নিচু-জাতকে নিচে দাবিয়ে রাখবার জন্য উঁচু-জাতের এক প্রচ্ছন্ন বা প্রকাশ্য প্রচেষ্টা।

ঊনিশ শতকের প্রায় মধ্যভাগে পৌঁছে আমরা জেলে-কৈবর্তদের প্রতি বর্ণহিন্দুসমাজের মনোভাবের কোনো পরিবর্তন হতে দেখি না। ১৮৩৭ সালের 'সমাচার দর্পণ'-এ প্রকাশিত চার ব্যক্তির স্বাক্ষরিত এক পত্রে কৈবর্তদের 'ভৃত্যতুল্য' বলে অভিহিত হতে দেখা যায়। উক্ত পত্রের অবশ্য কেউই ব্রাহ্মণবংশোদ্ভূত ছিলেন না। সকলেই ছিলেন কায়স্থ—'বসু', 'মিত্র' ও 'ঘোষ' পদবীধারী, যাঁরা আবার 'ব্রাহ্মণের ভৃত্য ব্রাহ্মণের দলভুক্ত' বলে গৌরবের সঙ্গে নিজেদের বর্ণনা দিয়েছেন। কৈবর্তদের প্রতি যদি 'ব্রাহ্মণের ভৃত্যদের' এই মনোভাব হয় তাহলে তাঁদের প্রতি ব্রাহ্মণদের তৎকালীন মনোভাব সহজেই অনুমেয়।

'সমাচার দর্পণ'-এর উল্লিখিত পত্র থেকে রাসমণির শ্বশুরকুলের লোকেদের বর্ণহিন্দুপদবাচ্য হবার একটা করুণ প্রয়াসও পরিলক্ষিত হয়। রাসমণির স্বামী রাজচন্দ্রের প্রপিতামহ বিজয়রাম কোলে তৎকালীন বর্ধমান জেলার অন্তর্গত সোনাটিকলি গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর পাঁচ পুত্র —জ্যেষ্ঠ দুলাল, মধ্যম সদাশিব, তৃতীয় কান্ত, চতুর্থ কন্দর্প ও পঞ্চম কণ্ঠিরাম। একমাত্র কান্ত ও তাঁর পুত্ররা ব্যতীত অপর চার ভাই ও তাঁদের বংশধরেরা সমাজপতিদের উৎকোচে বশীভূত করে তাঁদের সাহায্যে 'ঘোষ' পদবী নিয়ে কায়স্থ হিসেবে পরিচিত হতে চেয়েছিলেন অর্থাৎ এখানে তাঁরা ক্ষত্রিয়ত্বের দাবিদার হয়েছিলেন বলা যেতে পারে। কিন্তু এ-বিষয়ে তাঁরা বিশেষ সফলকাম হতে পারেন নি। তাঁদের 'ঘোষ' পদবিধারী সদগোপ হয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল।[১]

বুদ্ধিমান কান্ত দাস (কোলে) কিন্তু জ্ঞাতিভাইদের জাতোন্নয়ন প্রচেষ্টার দুর্ভাগ্যজনক পরিণতি দেখে যথোচিত শিক্ষা নিয়েছিলেন। তিনি অত্যন্ত ধর্মপ্রাণও ছিলেন এবং কোনোক্রমেই তথাকথিত বিধিনির্দিষ্ট 'আপন জাতিকুল' ছাড়তে রাজি ছিলেন না। কান্ত দাস ও তাঁর পুত্র প্রীতরাম নিজেদের কুল-পরিচয় বজায় রেখেই নিম্নবর্ণিত একাধিক ভিন্নতর উপায়ে নিজেদের বংশ মর্যাদার অভিবৃদ্ধি ঘটাতে চেষ্টিত হয়েছিলেন।

ব্যবসায়ে অর্থাগম

মাত্র চোদ্দ বৎসর বয়সে পিতৃহীন হয়ে প্রীতরাম ভাগ্য-অন্বেষণে জানবাজারে (গ্রাম সুবাদে) পিসির স্বচ্ছল সংসারে এসে আশ্রয় নেন এবং পিসি ও পিসিদের সক্রিয় উৎসাহে তিনি বাঁশের কারবারে প্রচুর অর্থ কামাতে থাকেন। বংশ-মর্যাদার অভাবকে এইভাবে তিনি অর্থকৌলীন্য দিয়ে পুষিয়ে দিতে চাইলেন।

কিন্তু এ-বিষয়ে তিনি বিশেষ কৃতকার্য হতে পারেন নি। বর্ণহিন্দুসমাজের লৌহ-কপাট তাঁর জন্যে একটুও উন্মুক্ত হলো

---

১ বাংলাদেশে কোনোদিন ক্ষত্রিয় জাতির অস্তিত্ব ছিল না। প্রবাদ আছে যে, পরশুরাম কর্তৃক আর্যভূমি নিঃক্ষত্রিয় করার অভিযান শুরু হলে, কিছু সংখ্যক ক্ষত্রিয় পালিয়ে এসে বাংলাদেশে আশ্রয় নেন ও 'কায়স্থ' নামে পরিচিত হন।

না। বাঁশের কারবার চালাতে প্রীতরাম মকিমপুর পরগণা থেকে রাশি রাশি বাঁশ জলে ভাসিয়ে আনতেন। চলতি কথায় এই রাশিকৃত ভাসমান বাঁশকে বলা হতো 'মাড়'। তাই লোকমুখে প্রীতরামের নামের সঙ্গে নতুন পদবী যুক্ত হলো, আর তিনি প্রীতরাম মাড় ও তাঁর বংশ মাড়-বংশ বলে চিহ্নিত হলো। বংশের এই নতুন নামকরণের মধ্য দিয়েই তাঁর প্রতি জনমানসের একটা প্রচ্ছন্ন তাচ্ছিল্য ও অবহেলার ভাব প্রকাশ পেতে দেখা যায়। প্রথমত কায়িক পরিশ্রমকে হিন্দুদের বর্ণাশ্রমশাসিত সমাজ কোনোদিনই শ্রদ্ধার চোখে দেখে নি। তা ছাড়া, স্বীয় জাত ব্যবসার চেয়ে বাঁশের কারবার অধিকতর অর্থকরী হলেও বাঁশের কারবারও ছিল মূলত নিচজাতিভুক্ত ব্যক্তিদেরই কারবার। সুতরাং প্রীতরামের বংশের আর্থিক বুনিয়াদ স্থাপনের সহায়ক হলেও, বাঁশের কারবার বংশের সামাজিক মর্যাদা বাড়াতে পারে নি। এর স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়— যখন আমরা দেখি, উঁচুজাতের অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক ব্যক্তিরাও তার মতন প্রবীণ ও বিত্তশালী ব্যক্তিকেও 'তুমি' বলে সম্বোধন করতে কুণ্ঠিত হতো না।

জমিদারী ক্রয়

তবে ভারতের মতন কৃষিপ্রধান দেশে ভূসম্পত্তির মালিকদের জনমানসে বরাবরই এক মর্যাদার আসন রাখা আছে। তাই দেখা যায়, এদেশে ব্যবসায়ী, চাকুরীজীবী প্রমুখ প্রায় সকল শ্রেণীর লোকেরা কিছু উদ্বৃত্ত বিত্তের অধিকারী হলেই এক নতুন মর্যাদা লাভের আশায় তা ভূসম্পত্তি ক্রয়ে বিনিয়োগ করে ভূস্বামী পর্যায়ভুক্ত হতে উৎসাহী হয়ে ওঠেন। এমন কি, ইংরেজের সংস্পর্শে এসেও এবং ইংরেজী শিক্ষা লাভ করেও ভারতীয় বিত্তবানদের এই প্রবণতা আদৌ হ্রাস পেতে দেখা যায় নি। তাই দেখি, দ্বারকানাথ ঠাকুরের মতন শিল্পোদ্যোগী কৃতী পুরুষও প্রভূত ভূসম্পত্তি কেনেন এবং নিজেকে 'জমিদার' বলে পরিচিত করতে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন।

ভারতীয়দের উক্ত প্রবণতা-অনুযায়ী প্রীতরাম তাঁর বাঁশের কারবারে অর্জিত উদ্বৃত্ত অর্থ অচিরেই একের পর এক পরগণা ক্রয়ে নিয়োজিত করেন এবং বাঁশের কারবার ক্রমে গুটিয়ে নেন। তিনি তখনকার দিনের প্রায় সাড়ে ছ-লক্ষ টাকার ভূসম্পত্তি রেখে মারা যান।

সমাজসেবা

রাজচন্দ্র ছিলেন প্রীতরামের একমাত্র জীবিত পুত্র। তিনি পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে পৈতৃক সম্পত্তি বাড়াতে মনোযোগী হয়েছিলেন। তিনি দ্বারকানাথ-প্রতিষ্ঠিত 'জমিদারী সভা'র সদস্য হয়েছিলেন। তবে তিনি এই সময়কার কাজকর্মে একটা নতুন মাত্রাও যোগ করেছিলেন। নানা লোকহিতকর কাজের অনুষ্ঠানেও তিনি এই সময় প্রবৃত্ত হলেন। ফলে রাজদরবারে রাজচন্দ্রের সম্মান ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেল। দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন, রুস্তম কাওয়াসজি-প্রমুখ বারো জন গণ্যমান্য ভারতীয়ের সঙ্গে রাজচন্দ্রও দেশীয় ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হলেন। 'রায় বাহাদুর' উপাধিও তাঁকে দেওয়া হলো।

কিন্তু বিদেশী ও বিধর্মী রাজার দ্বারা এভাবে সম্মানিত হলেও বর্ণাশ্রম-শাসিত হিন্দুসমাজে জানবাজার জমিদার বংশের অবস্থানের কোনো ইতরবিশেষ ঘটে নি। তিনি কৈবর্ত জমিদার হয়েই রইলেন।[২]

রাসমণির আমলে

রাজচন্দ্রের মৃত্যু হয় ১৮৩৬ সালের ৯ জুন। ৪৯ বছর বয়সে। রাণী রাসমণি ছিলেন তাঁর তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী। তিনি স্বামীর পরিত্যক্ত বিপুল ভূসম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারিণী হন এবং স্বামীর আরব্ধ কাজ সুসম্পন্ন করার দায়িত্ব নিজ স্কন্ধে তুলে নেন। এই প্রখর-ব্যক্তিত্বসম্পন্না মহিলা কিন্তু ভূসম্পত্তির পরিমাণ বাড়ানো থেকে বিরত রইলেন, কারণ একজন মহিলার পক্ষে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিস্তৃত বিশাল জমিদারীর সুষ্ঠু তত্ত্বাবধান করা প্রায় এক অসম্ভব কাজ ছিল।

বন্ধুপত্নীর এই অসহায়তা সম্পর্কে দ্বারকানাথ প্রথমাবধি সচেতন ছিলেন। তাই রাজচন্দ্রের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তিনি স্বেচ্ছায় রাসমণির জমিদারী দেখাশোনা করার দায়িত্ব নিতে এগিয়ে এসেছিলেন। বস্তুত দ্বারকানাথ কেবল এক দুর্ধর্ষ জমিদার ছিলেন না। বিশিষ্ট জমিদারদের উপদেষ্টারূপেও তিনি কাজ করতেন। দক্ষতাসহকারে ঐ কাজ সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে তিনি সুপ্রীম কোর্টের তদানীন্তন প্রথম সারির অ্যাডভোকেট রবার্ট কার্টলার ফার্গুসনের থেকে দেশের আইনকানুন সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হয়েছিলেন। যশোরের বরদাকান্ত রায়, বাগবাজারের দুর্গাচরণ মুখার্জি, কাশিমবাজারের হরিনাথ রায় ও পাইকপাড়ার কাত্যায়ণী-প্রমুখ জমিদারবর্গের তিনি উপদেষ্টা নিযুক্ত হয়েছিলেন। রাসমণি কিন্তু দ্বারকানাথের মতন এক বিশিষ্ট ব্যক্তিকে তাঁর জমিদারীর ম্যানেজার নিযুক্ত করতে কুণ্ঠিত হলেন।

তাই রানী জমিদারী পরিচালনার জন্য স্বামীর বন্ধুর চেয়ে নিজ জামাতাবর্গের ওপরই নির্ভরশীল হলেন। তাঁর তিন জামাতা সকলেই ঘর-জামাই হিসেবে তাঁরই গৃহে বসবাস করতেন। এঁদের মধ্যে তৃতীয় (পরে কনিষ্ঠ) জামাতা

মথুরমোহন বিশ্বাস-ই তাঁর সবচেয়ে আস্থাভাজন ছিলেন এবং বিষয়-সম্পত্তি দেখাশোনার ব্যাপারে দক্ষিণ-হস্ত স্বরূপ ছিলেন। কিন্তু উক্ত জামাতা তাঁর বিশ্বাসভঙ্গ করে কোম্পানির কাগজ বাবদ ও জমিদারীর অনেক অর্থ আত্মসাৎ করেছিলেন। ঐ অর্থ আদায় করতে রানী রাসমণিকে আদালতের দ্বারস্থ পর্যন্ত হতে হয়েছিল। অপর এক জামাইয়ের বিরুদ্ধেও তিনি অর্থ আত্মসাৎ করার অভিযোগে মামলা দায়ের করেছিলেন।[৩] এই অবস্থায় রানী তাঁর জমিদারীর আয়তন বাড়াতে স্বভাবতই দ্বিধাবোধ করেছিলেন।

রাসমণি কিন্তু অতি উচ্চাভিলাষিণী মহিলা ছিলেন। রাজচন্দ্রও তাঁর নেতৃত্ব স্পৃহাকে জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করেছিলেন। রাজচন্দ্র প্রায়শই রানীকে বলতেন — 'তুমি শুধু এক সাধারণ মেয়ে হয়ে জন্মাও নি। ঈশ্বর তোমাকে দিয়ে অনেক বড় কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন।'[৪] রানী জমিদারী বাড়াবার দিকে বিশেষ নজর না দিলেও তিনি স্বামীর প্রদর্শিত পথে সমাজসেবামূলক কাজকর্ম চালিয়ে যেতে আদৌ কসুর করেন নি। এই সময় তাঁকে সমাজ-সংস্কারকের এক গৌণ ভূমিকায়ও দেখা যায়। 'কুলীনদের বহু বিবাহ নিবারণের জন্য' রাসমণির কাছ থেকে এক আবেদনপত্র ব্যবস্থাপক সভায় জমা দেওয়া হয়েছিল।[৫]

শুধু বৃহৎ বৃহৎ ব্যাপারেই নয়, ছোটোখাটো ব্যাপারেও স্বয়ং রাসমণিকেও ব্রাহ্মণদের পক্ষ থেকে সামান্য শিষ্টতাটুকু পর্যন্ত দেখান হতো না। দোলের আগে ডজনখানেক গরুর গাড়িতে পিচকিরি, ফাগ, আবির, কুমকুম আর ছাঁচের হরেক-রকম খেলা জানবাজারের বাড়িতে কিনে আনা হতো ও ঠাকুরদালানের পাশে রেখে দেওয়া হতো। প্রতিবেশীরা এসে তা থেকে যার যা খুশি তুলে নিত এবং যাবার সময় রানীমার সঙ্গে দেখা করে যেত। কুলশ্রেষ্ঠরাও আসতেন পিচকিরি ইত্যাদি নিতে কিন্তু যাবার সময় রাসমণির সঙ্গে দেখা করে যেতেন না। ব্রাহ্মণদের এই অবজ্ঞা রানীর মনে বেশ বিঁধত। কোনো ব্যক্তির ধন হয়েছে অথচ মান নেই তার ব্যথা নিশ্চয়ই মনে গিয়ে লাগে।[৬]

স্বকীয় বংশমর্যাদা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে রাসমণি এখন দক্ষিণেশ্বরে এক মন্দির-জট নির্মাণে উদ্যোগী হন।

মন্দির নির্মাণ

হিন্দু জমিদারদের সামাজিক মর্যাদালাভের একটা প্রচলিত পন্থা ছিল হিন্দুদের আরাধ্য দেব-দেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করা। প্রতিষ্ঠিত মন্দিরের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠাতা ও তাঁর বংশের সুনাম লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ত। পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের অধিবাসীরা প্রতিদিন দু-বেলা মন্দিরে পুজো দেখতে ও প্রসাদ খেতে আসত। আবার বিশেষ উৎসবাদি উপলক্ষ্যে দূর দূর থেকে ভক্তরা ও পুণ্যলোভীরা মন্দির-প্রাঙ্গনে এসে জমায়েত হতো ও মেলা বসত। এখন, মন্দির প্রতিষ্ঠার কাজ আমাদের দেশে আবহমানকাল থেকে চলে আসলেও ইংরেজ আমলের শুরু থেকে তার সংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকে। তখন ইংরেজদের সঙ্গে ব্যবসাসূত্রে কিছু ভুঁইফোড় শ্রেণীর মানুষ প্রচুর কাঁচা টাকা উপার্জন করেছিলেন। তা দিয়ে তাঁরা জমিদারীর পর জমিদারী কিনতে থাকেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক স্বীকৃতি ও নেতৃত্ব লাভের আশায় সমুৎসুক হয়ে ওঠেন। এরই ফলশ্রুতিতে মন্দিরের সংখ্যাবৃদ্ধি। সংগৃহীত তথ্য থেকে নতুন মন্দির নির্মাণের এই চিত্রটি ফুটে ওঠে: ১৭০০ থেকে ১৭৫০ সালের মধ্যে ২১৭টি; ১৭৫০ থেকে ১৮০০ সালের মধ্যে ৩৮১টি; এবং ১৮০০ থেকে ১৮৫০ সালের মধ্যে ৪৭০টি।[৭]

রাসমণিও অচিরেই এই প্রবাহে যোগ দেন এবং লোকের নজরকাড়া এক মন্দির-জট নির্মাণ করেন। তবে তাঁর বেলায় ঐ অভিনব মন্দির-জটটি গড়ার পেছনে তৎকালীন জমিদারশ্রেণীর সাধারণ প্রবণতা ছাড়াও এক বিশেষ কারণ সক্রিয় ছিল। তা হলো মন্দির-জটটিকে কাজে লাগিয়ে জাতে ওঠার একটা প্রচেষ্টা চালান।

রাসমণির সমসাময়িক কালেও স্থানীয় জমিদারেরা কেবল উচ্চ বিত্তবানই ছিলেন না, উচ্চ-বর্ণীয়ও ছিলেন। তাই এঁরা কেউই একজন শূদ্রাণী কর্তৃক মন্দির ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার কাজকে আদৌ সুনজরে দেখেন নি এবং প্রথম থেকেই রাসমণিকে তাঁদের বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

কথায় বলে, 'ভাগীরথীর পশ্চিমকূল বারাণসীর সমতুল'। তাই রানী প্রথমে কলকাতার নিকটবর্তী গঙ্গার পশ্চিম তীরবর্তী বালী-উত্তরপাড়া অঞ্চলে পরিকল্পিত মন্দির-জট নির্মাণের জন্য এক বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের সন্ধানে প্রবৃত্ত হলেন এবং জমির চড়া মূল্য দিতে রাজি থাকলেও সেখানকার প্রসিদ্ধ জমিদারগণ শূদ্রাণীকে ভাগীরথীকূলের জমি বিক্রি করতে সম্মত হলেন না। তাঁদের মনে হয়েছিল শূদ্রাণীর মন্দির নির্মাণ যেন 'গণিকার গঙ্গা স্নান'।

ভাগীরথীর পশ্চিমকূলে প্রয়োজনীয় জমি পেতে ব্যর্থকাম হয়ে রাসমণি এখন পূর্বকূলের দিকে নজর ফেরালেন এবং ভাটপাড়া অঞ্চলে শ্মশান-সংলগ্ন এক খণ্ড জমি তাঁর প্রয়োজন-উপযোগী বলে সাব্যস্ত করলেন। জনৈক বলরাম সরকার উক্ত জমির মালিক ছিলেন এবং উপযুক্ত মূল্যের বিনিময়ে তা রানীকে বিক্রি করতেও রাজি হয়ে গেলেন।

ইতিমধ্যে এ-সংবাদ ভাটপাড়ার কট্টর পণ্ডিত সমাজের কানে পৌঁছলে তাঁরা দল বেঁধে এসে বলরামবাবুকে শাসিয়ে যান ও তাঁকে 'পতিত' করার ভয় দেখান। ফলে তিনি পিছিয়ে গেলেন।

অবশেষে বাধ্য হয়ে রাসমণি দক্ষিণেশ্বরের জমির দিকে দৃষ্টি ফেরালেন। এখানে এক প্লটে ৬০ বিঘা জমি ছিল। কোনো হিন্দু জমিদার এর মালিক ছিলেন না। কলকাতা হাইকোর্টের এটর্নি হেস্টি সাহেব এই জমির মালিক ছিলেন। স্বভাবতই একজন ইংরেজ আইনজীবীর পক্ষে হিন্দু সমাজপতিদের ভ্রূকুটিকে গ্রাহ্য করার কোনো কারণ ছিল না। ১৮৪০ সালের ৬ সেপ্টেম্বর রাসমণি তাঁর বহু-আকাঙ্ক্ষিত মন্দির-জট নির্মাণের উদ্দেশ্যে সেই জমি হেস্টি সাহেবের কাছ থেকে কিনে নিলেন।

এবার মন্দির-জটের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হলো। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বাদ সাধতে আবার এগিয়ে এলেন হিন্দু জমিদারকুল, বিশেষ করে নড়াইল ও সাতক্ষীরার দুই বিখ্যাত জমিদার রামরতন রায় ও প্রাণনাথ চৌধুরী। তাঁরা রাসমণিকে হুঁশিয়ারী দিয়েছিলেন এবং মিথ্যা মামলায়ও জড়িয়ে ছিলেন। কিন্তু একগুঁয়ে রানী সমস্ত বাধাবিপত্তি তুচ্ছ করে তাঁর পরিকল্পনাকে রূপ দিতে এগিয়ে এলেন এবং ১৮৫২-৫৩ সাল নাগাদ প্রায় ৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তার নির্মাণকার্য শেষ করেন। বিগ্রহ তৈরির কাজও ক্রমে সম্পন্ন হয়। ১৮৫৩ সালের ১৪ মার্চ 'সংবাদ প্রভাকর'-এ সংবাদ পরিবেশিত হলো যে, আগামী বৈশাখী পূর্ণমাসী তিথিতে 'শ্রীমতী' দক্ষিণেশ্বরে 'মহতী কীর্তি' স্থাপন করবেন। কিন্তু এই সংবাদ পরিবেশিত হবার প্রায় তিন বছরেরও অধিককাল পরে ১৮৫৬ সালের স্নানযাত্রার দিন দেবালয় ও বিগ্রহ 'প্রতিষ্ঠিত' হতে পেরেছিল। এতখানি বিলম্বের কারণ কৈবর্তকন্যার মন্দিরে পৌরোহিত্য গ্রহণে ব্রাহ্মণদের আপত্তি। বস্তুত এই স্তরে রাসমণির ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণদের আন্দোলনকে একটা সঙ্ঘবদ্ধ রূপ নিতে দেখা যায়।

রাসমণি সেদিন দক্ষিণেশ্বরে যে মন্দির-জট গড়ে তুলেছিলেন এবং যে-সব বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তাদের মধ্যে তিনি কালীমূর্তি (ভবতারিণী) ও তার মন্দিরকেই সর্বাধিক প্রাধান্য দিয়েছিলেন। এর কারণ একটু গভীরে তলিয়ে না দেখলে, ব্যাপারটা আমাদের কাছে কিছুটা অদ্ভুত ঠেকতে পারে, কেন না রাসমণির শ্বশুরকুল ও পিতৃকুল উভয়ই ছিল বৈষ্ণববংশীয়। শ্বশুরকুলে গৃহদেবতা ছিলেন রঘুনাথ আর পিতৃকুলের গৃহদেবতা ছিলেন রাধা-মাধব। তাছাড়া প্রকাশ, একদিন এক সন্ন্যাসী তাঁর ঝুলি থেকে এক কৃষ্ণবর্ণ শিলাখণ্ড বার করে রাসমণির হাতে তুলে দিয়ে বলেছিলেন—'ইনিই তোমাদের আরাধ্য রঘুনাথ। এঁকেই প্রতিষ্ঠা করবে তুমি।' কাজেই রাসমণি দক্ষিণেশ্বরে যে মন্দির-জটটি গড়ে তুলেছিলেন এবং যে-সব বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তাদের মধ্যে রাধাকান্তের বিগ্রহ ও মন্দিরকেই অগ্রাধিকার দেওয়া তাঁর কর্তব্য ছিল। কিন্তু তা না করে তিনি কালীমূর্তি ও তার মন্দিরকেই সর্বাধিক প্রাধান্য দিয়েছিলেন। এবং তিনি তাঁর নামাঙ্কিত জমিদারী শীলমোহরে নিজেকে 'কালীপদ অভিলাষিণী' বলে ঘোষণা করেছিলেন। এর সম্ভাব্য কারণ হলো, তৎকালীন বাংলাদেশে অধিকাংশ জমিদারই ছিলেন শক্তি-উপাসক। সেই জাতীয় দুর্দিনে বংশীধারী কৃষ্ণের চেয়ে অসিধারী কালী-ই জমিদারবৃন্দের অধিকতর আনুগত্যের দাবি রাখত। বিশেষত জমিদারেরা তখন অনেকেই ডাকাতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন আর কালী হলেন ডাকাতদের উপাস্য দেবতা। রাসমণি পুরোদস্তুর জমিদারী মর্যাদা লাভের উদ্দেশ্যেই নিজেকে কালী-উপাসক বলে জাহির করেছিলেন। জানবাজার জমিদার বাড়ির গৃহদেবতা যদি হন রঘুনাথ, তাহলে ভবতারিণী হলেন তার জমিদারী দেবতা। নবদ্বীপের শাক্ত রাসে কালী ও কৃষ্ণের সহাবস্থান রাসমণিকে প্রভাবিত করেছিল বলে মনে হয়। আমরা জানি, নবদ্বীপে তাঁর ঘন ঘন যাতায়াত ছিল।

পুরোহিত নিয়োগ

শূদ্রাণীর প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে পৌরোহিত্য করতে ব্রাহ্মণকুল অসম্মত হওয়ায় রানী বিপাকে পড়লেন এবং একটা অনুকূল ব্যবস্থাপত্র সংগ্রহের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। দূর দূর স্থানে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের কাছে তিনি দূত পাঠালেন কিন্তু উৎসাহব্যঞ্জক উত্তর কোথা থেকেও এল না। এইভাবে যখন তিনি মন্দিরের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে প্রায় নিরাশ হয়ে পড়েছেন তখন কামারপুকুরের পণ্ডিত রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে এক ব্যবস্থা এল—রানী যদি প্রতিষ্ঠার পূর্বে মন্দির ও মন্দিরের সম্পত্তি কোনো ব্রাহ্মণকে দান করেন আর সেই ব্রাহ্মণ যদি উক্ত মন্দিরে দেবীর প্রতিষ্ঠা ও অন্নভোগের ব্যবস্থা করেন তা হলে শাস্ত্র নিয়ম যথাযথ রক্ষিত হবে। তখন ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্গীয় হিন্দুগণ দেবালয়ে অন্নগ্রহণ করলেও দোষভাগী হবেন না। কামারপুকুর অঞ্চলের সিংহড় গ্রামের মহেশ চক্রবর্তী ও দেশড় গ্রামের রামধন ঘোষ রাসমণির সেরেস্তার দুই কর্মচারী ছিলেন। মনে হয়, প্রধানত তাদেরই প্রচেষ্টা এবং প্রচুর দক্ষিণার বিনিময়ে দরিদ্র রামকুমারের কাছ থেকে সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাপত্রটি সংগৃহীত হয়েছিল।

পণ্ডিত রামকুমারের ব্যবস্থাপত্র থেকে রাসমণি পথের হদিশ পেলেন। তিনি আপন গুরুর নামে আনুষ্ঠানিকভাবে মন্দির উৎসর্গ করলেন এবং তাঁর 'অনুমতিক্রমে' নিজে দেবসেবার তত্ত্বাবধায়ক কর্মচারী নিযুক্ত হলেন। এত কিছু করেও কিন্তু কোনো শাস্ত্রজ্ঞ ও সুযোগ্য পুরোহিত মন্দিরের পৌরোহিত্য নিতে সম্মত হলেন না। তাদের বক্তব্য হলো, রামকুমারের প্রদর্শিত পন্থা শাস্ত্রবিরুদ্ধ না হলেও সামাজিক প্রথাবিরুদ্ধ। বিশেষত শূদ্রের গুরু ও তার উৎসর্গীকৃত মন্দিরের পুরোহিত তাঁদের চোখে ব্রাহ্মণ বলেই গ্রাহ্য নয়। তাঁরা শূদ্রেরই সামিল।

বৃহত্তর পণ্ডিত সমাজের এই আপত্তি অবশ্য একেবারে উড়িয়ে দেবার মতন নয়। 'প্রেমবিলাস' গ্রন্থ (পৃ ১৮৯) থেকে আমরা দেখতে পাই, অনেক ব্রাহ্মণবংশ দারিদ্র্যের চাপে নিচু কর্মে নিযুক্ত হলো, আর তথাকথিত নিচু-জাতদের পুরোহিত হলো। রাসমণি নিজেও সে-কথা প্রকারান্তরে স্বীকার করেছেন। কুলগুরুর নামে মন্দির উৎসর্গ করলেও তিনি কুল-পুরোহিত বা গুরু-বংশের অন্য কোনো ব্রাহ্মণকে পুরোহিতের পদে বসাতে আগ্রহ দেখান নি। কাজেই সংশ্লিষ্ট পুরোহিতের পদটি শূন্যই থেকে গেল। তখন স্বয়ং ব্যবস্থাদাতা রামকুমার পণ্ডিতকে সেই পৌরোহিত্য গ্রহণের অনুরোধ জানিয়ে প্রস্তাব পাঠান হলো।

এখন, রামকুমার ছিলেন নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব বংশের সন্তান। অতএব তাঁর পক্ষে প্রভূত ছাগরক্তলাঞ্ছিত কালী মন্দিরের পুরোহিত পদে প্রতিষ্ঠিত হওয়া আপাতদৃষ্টিতে একপ্রকার অসম্ভব ছিল। কিন্তু এক্ষেত্রে দেখা গেল, প্রয়োজন বড় বালাই। রামকুমারের সংসার দরিদ্রের সংসার। বিশেষত পিতার মৃত্যুর পর বৃহৎ পরিবারটির একমাত্র উপার্জনশীল ব্যক্তি ছিলেন তিনি। পরিবারের স্থায়ী আয় বাড়াবার উদ্দেশ্যে রামকুমার ইতিমধ্যে কলকাতার ঝামাপুকুরে এসে টোল খুলেছিলেন। কিন্তু সেই ইংরিজি শিক্ষার যুগে টোলে অধ্যাপনার চেয়ে রাসমণির মন্দিরের যজমানিতে অধিকতর আয়ের সম্ভাবনা দেখে তিনি কালীমন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে কালী মন্দিরের পূজকের পদটি গ্রহণ করলেন। অবশেষে রামকুমারের পৌরোহিত্যেই মন্দিরটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হলো এবং পরদিন থেকে ভবতারিণীর মন্দিরে দৈনন্দিন পূজার দায়িত্বও তাঁর ওপর বর্তাল।

মহাসমারোহে মন্দিরটি প্রতিষ্ঠার কাজ সম্পন্ন হয়েছিল। সুদূর কাণ্যকুব্জ, বারাণসী, শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম, মাদ্রাজ, উড়িষ্যা, নবদ্বীপ প্রভৃতি পণ্ডিত-প্রধান স্থান থেকে বহু অধ্যাপক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত সেদিন আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন। তাঁরা কিন্তু সেদিন মন্দিরের অন্নভোগ গ্রহণ করেন নি; যদিও তাঁরা রানীর প্রদত্ত অর্থ, বস্ত্র ইত্যাদি 'শুকনো দান' নির্দ্বিধায় গ্রহণ করেছিলেন।[৮] 'অশূদ্রযাজিত্বে' ও 'অপ্রতিগ্রাহিত্ব' নীতি-অনুসারে 'শুকনো দান' গ্রহণেও ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষেধ আছে। অর্থগৃধ্নু ব্রাহ্মণরা কিন্তু শাস্ত্রোক্ত এই নিষেধ এড়িয়ে গিয়ে শূদ্র প্রদত্ত অন্নভোগকে মাত্র তাঁরা তাঁদের আক্রমণস্থল করেছিলেন। রাসমণি গোড়া থেকেই তৎকালীন কুলীন ব্রাহ্মণ সমাজের উক্ত দুর্বলতাটিকে নিজের উদ্দেশ্য সাধনের কাজে লাগাতে চেয়েছেন। তিনি স্বল্পতম বাধার পথ ধরে ধাপে ধাপে এগোতে মনস্থ করেছিলেন। তাই তিনি অন্নভোগের আগে ব্রাহ্মণদের 'শুকনো' বস্তু দান করতে অভিলাষী হয়ে নবদ্বীপের পণ্ডিতসমাজকে বেছে নিয়েছিলেন মন্দির-জটের নির্মাণকার্য চলার সময়েই। সেকালেও নবদ্বীপ ছিল হিন্দু কৃষ্টি ও সংস্কৃতি চর্চার এক পীঠভূমি। যদিও অতীতে ঐ কেন্দ্রে গোঁড়ামির যথেষ্ট প্রাবল্য ছিল, তবু দীর্ঘকাল নব্য-ন্যায় চর্চা ও চৈতন্য প্রবর্তিত ভক্তি-আন্দোলনের প্রভাবে স্থানীয় পণ্ডিত মহলের মধ্যে জাতপাত সম্পর্কে ধ্যান-ধারণায় কঠোরতা বেশ খানিকটা শিথিল হয়ে পড়েছিল। রাসমণি ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য বর্ণহিন্দুদের অন্তত আংশিক স্বীকৃতিলাভের উদ্দেশে এই শিথিলতার সুযোগ নিতে চেয়েছিলেন। ১৮৫১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের 'সংবাদ ভাস্কর' পত্রিকায় প্রকাশিত নবদ্বীপবাসী 'জনৈক বিপ্র'-র এক পত্র থেকে আমরা জানতে পারি যে, গত চন্দ্রগ্রহণের রাত্রে রানী রাসমণি নবদ্বীপে এসে 'সুরুধুনি তটে' চারহাজার টাকা নগদ ও 'পাঁচ শত রক্তবর্ণ বনাত' উৎসর্গ করে ছোটো-বড়ো পণ্ডিতদের মধ্যে বিতরণ করেছেন। পণ্ডিতমশাইরা ঐ দান 'বিশেষ সন্তুষ্টতার সহিত' গ্রহণ করে পুণ্যবতীকে 'সর্বান্তঃকরণের সহিত' আশীর্বাদ জানিয়েছিলেন। তবে রাসমণির 'শুকনো দান' গ্রহণ করেও সংশ্লিষ্ট পণ্ডিতমশাইরা যে শাস্ত্রবিরুদ্ধ কাজ করেছিলেন তার পরিচয় আমরা পাই একটা ব্যতিক্রম থেকে। নবদ্বীপের অগ্রগণ্য পণ্ডিত দেবী তর্কালঙ্কারের পৌত্র রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য 'শ্রীমতীর দান গ্রহণ করেন নাই' কেন না, হিন্দুশাস্ত্রীয় নির্দেশ অনুসারে সর্ববিধ অশূদ্রযাজিত্ব ব্রাহ্মণত্বের একটা বড় লক্ষণ।

কাজেই মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন যে বহু ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত রানীর কাছ থেকে শুধু 'শুকনো দান' নিয়েছেন তা তাঁদের অর্থগৃধ্নুতারই পরিচায়ক, রানীর 'জলাচরণীয়' হবার পক্ষে তা আদৌ সহায়ক হয় নি। এমন কি, স্বয়ং ব্যবস্থাদাতা ও পুরোহিত রামকুমারও সেদিন মন্দিরের উৎসর্গীকৃত অন্নভোগ গ্রহণ করেন

নি। তিনি সরকার থেকে সিধা নিয়ে গঙ্গাতীরে স্বহস্তে রেঁধে খেয়েছিলেন। আর রামকুমারের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধর (ভাবী রামকৃষ্ণ) শূদ্রাণীর সিধা নিতেও অস্বীকৃতি জানিয়ে বাজার থেকে দু-পয়সার মুড়ি কিনে ক্ষুণ্ণিবৃত্তি করেছিলেন। গদাধর পিতার অশূদ্রযাজিত্ব ও অপ্রতিগ্রাহিত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে এবং মন্দিরের পৌরোহিত্য গ্রহণের জন্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে মৃদু তিরস্কারও করেছিলেন। তবে মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন অবধি রামকুমারের মনে কিছু সংস্কারের বাধা থাকলেও পরদিনই তিনি তা কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলেন এবং মন্দিরের প্রসাদী অন্ন খেতে শুরু করেছিলেন। গদাধরকে এই সময় অনেক বুঝিয়েও কিন্তু অন্নভোগ গ্রহণে রাজি করান যায় নি। তবে তিনি মন্দিরের ভাণ্ডার থেকে সিধা নিয়ে স্বহস্তে রেঁধে খেতে আরম্ভ করেছিলেন। বেশ কিছুকাল পরে, যখন তিনি মন্দিরের একজন সেবক নিযুক্ত হলেন তখন তিনি অবশ্য প্রসাদী অন্নই দুবেলা গ্রহণ করতেন। তখনও তাঁর মানসিক দ্বন্দ্ব সম্পূর্ণ কাটে নি। সে-সময় তাঁকে আক্ষেপ করে বলতে শোনা গিয়েছে—আমাকে কৈবর্তের অন্ন খাওয়ালি মা!

যাই হোক, কামারপুকুরের এক দরিদ্র পরিবারের দুই সহোদর ভাইকে অর্থনৈতিক কারণে যে-কাজ করতে হয়েছিল কুসংস্কারাচ্ছন্ন জাত্যাভিমানী বৃহত্তর ব্রাহ্মণ সমাজ তা করতে কখনই রাজি হলেন না। তাই মন্দির প্রতিষ্ঠার ধুমধাম থেমে গেলেও অবস্থার বিশেষ কোনো গুণগত পরিবর্তন হলো না। মন্দিরের নিবেদিত অন্নভোগ গ্রহণ করতে ব্রাহ্মণ সমাজের অনীহা পুরোমাত্রাতেই বজায় রইল। এমন কি, গরীব কাঙালেরাও অনেকে ঐ একই কারণে রাসমণির ঠাকুরবাড়িতে পাত পাততে অস্বীকৃত ছিল। খাওয়ার লোকের অভাবে কতদিন অন্নভোগ গরুকে খাওয়াতে, আর অবশিষ্টাংশ গঙ্গার জলে ফেলে দিতে হয়েছে।

দেবতার মর্যাদা

বর্ণহিন্দুসমাজ শুধু দেবতার প্রসাদী অন্ন গ্রহণ করতেই প্রচণ্ড আপত্তি জানান নি, সামান্য একটু মাথা নুইয়ে মন্দিরের দেবতাকে সামান্যতম শ্রদ্ধা জানাতেও তারা পরাঙ্মুখ ছিলেন। রানী অবশ্য বেশ আটঘাট বেঁধেই কাজে নেমেছিলেন। শূদ্রের প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের মর্যাদা নিয়ে বর্ণহিন্দুদের মনে 'কিন্তু' থাকতে পারে, এটা অনুমান করেই বুদ্ধিমতী রানী আগেভাগেই একটু চালাকির আশ্রয় নিয়ে দুটি 'স্বপ্নাদেশে'র কথা প্রচার করেছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে যে মাতৃমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে সেই মূর্তির আধারে যে দেবতা বাস করছেন, তিনি যে হিন্দুদের শ্রেষ্ঠ তীর্থ বারাণসীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী স্বয়ং অন্নপূর্ণা ব্যতীত আর কেউ নন, কুসংস্কারাচ্ছন্ন জনমানসে সেই প্রত্যয় সৃষ্টি করাই ছিল 'স্বপ্নাদেশ' দুটির কাজ। বারাণসী গিয়ে বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণাকে দর্শন করে পুজো দেবার মনস্কামনা করে রাসমণি প্রচুর আয়োজন নিয়ে বারাণসীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করে বেরিয়েছেন এমন সময় স্বপ্নে তিনি দেবীর প্রত্যাদেশ পেলেন—'কাশী যাইবার আবশ্যক নাই। ভাগীরথীর তীরে মনোরম প্রদেশে আমার মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া পূজা ও ভোগের ব্যবস্থা কর। আমি ঐ মূর্ত্যাশ্রয়ে আবির্ভূতা হইয়া তোমার নিকট হইতে নিত্য পূজা গ্রহণ করিব।' প্রকাশ, উক্ত 'প্রত্যাদেশ' থেকেই দক্ষিণেশ্বর পরিকল্পনা রূপ পেয়েছে এবং যেহেতু অন্নপূর্ণ সারা বিশ্বের অন্নদাত্রী সেহেতু তার পুজোয় অন্নভোগের ব্যবস্থাই স্বাভাবিক এমন একটা ইঙ্গিতও বোধহয় স্বপ্নাদেশটির মধ্যে নিহিত আছে।

প্রথম স্বপ্নাদেশটির মন্দির ও দেবীমূর্তি নির্মিত হলে শাস্ত্রোক্ত উপায়ে প্রতিষ্ঠার জন্য যখন রানী শুভদিনের অপেক্ষায় ছিলেন তখন তিনি মূর্তিটির আঘাত পাবার আশঙ্কায় সেটিকে বাক্সবন্দী করে রেখেছিলেন। এখন স্বপ্নে রানীর দ্বিতীয় 'প্রত্যাদেশ'টি এল—'আমাকে আর কতদিন আবদ্ধ করিয়া রাখিবি? আমার যে বড় কষ্ট হইতেছে; যত শীঘ্র পারিস আমাকে প্রতিষ্ঠিত কর।' এই শেষ প্রত্যাদেশটি বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার উদ্দেশ্যে রাসমণি শাস্ত্রনির্দিষ্ট কোনো প্রশস্ত দিনের জন্য আর অপেক্ষা না করেই যত শীঘ্র সম্ভব এক সাধারণ শুভদিনে অর্থাৎ স্নানযাত্রার দিন মন্দির ও মূর্তি প্রতিষ্ঠা করতে মনস্থ করলেন।

রাসমণির প্রচারিত স্বপ্নাদেশ দুটি দেশের বৃহত্তর ব্রাহ্মণ সমাজের কাছে আদৌ গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় নি। প্রয়োজনে মতলব নিয়ে এমন সব 'প্রত্যাদেশ' তাঁরা নিজেরা ভূরি ভূরি প্রচার করে থাকেন। বস্তুত এটা ব্রাহ্মণদের নিজস্ব ক্ষেত্র। একজন কৈবর্ত কন্যার সেখানে অনুপ্রবেশ তাঁরা বরদাস্ত করতে চান নি।[৯]

পুরোহিতের নতুন মর্যাদা

১৮৯৭ সালের নভেম্বরে লাহোরে আর্য সমাজী আন্দোলনের নেতা হংসরাজ লালার সঙ্গে বিবেকানন্দের সাক্ষাত ঘটে। তখন কথা প্রসঙ্গে স্বামীজী মন্তব্য করেন যে, কোনো দেবালয়কে জনমানসে শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত করার সহজতম উপায় হলো তার পুরোহিতকে একজন অবতার বলে চিহ্নিত করা।[১০] স্বামীজীর এই মন্তব্যের সত্যতার পরিচয় আমরা দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের ক্ষেত্রেও দেখতে পাই। বস্তুত সেখানকার মন্দির-জটটির প্রধান পুরোহিত গদাধর 'অবতার' বলে স্বীকৃতি পাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রাসমণির এক অখ্যাত ও অবজ্ঞাত

দেবালয় এক জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হলো আর কৈবর্ত রমণী রাসমণি লোকমাতারূপে বন্দিতা হতে লাগলেন। বলা বাহুল্য, গদাধরকে অবতার করার ক্ষেত্রে অন্তত প্রাথমিক পর্যায়ে জানবাজারে রাসমণি ও মথুরমোহনকে সক্রিয় ভূমিকা নিতে দেখি। বংশমর্যাদা বাড়াবার তাগিদেই যে তাঁরা প্রধানত এ-কাজ করেছিলেন তা একরকম নিঃসন্দেহেই বলা যেতে পারে।

বর্তমান অধ্যায়ে আমরা দেখলাম কেন একজন কৈবর্ত রমণী-প্রতিষ্ঠিত মন্দিরের পুরোহিতকে অবতারের মহিমামণ্ডিত করতে হয়েছিল। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা দেখব কেমন করে ঐ উল্লিখিত পুরোহিতকে অবতারের আসনে উন্নীত করা হয়েছিল।

উল্লেখপঞ্জী

১. 'সমাচার দর্পণ', ৫ আগস্ট ১৮৩৭

২. ১৮২৩ ও ১৮২৫ সালে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় যথাক্রমে 'কলিকাতা কমলালয়' ও 'নববাবু-বিলাস' নামে দুটি ব্যঙ্গ রচনা প্রকাশ করেন। গ্রন্থ দুটিতে লেখক দেখিয়েছেন, বিষয়কর্মে ধন সঞ্চয় করলেও শুধু তার জোরে সামাজিক উঁচু শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হবার সম্ভাবনা তখনও বিশেষ দেখা দেয় নি। সামাজিক শ্রেণীমর্যাদা সে যুগেও ছিল প্রধানত কুলগত বা বংশগত, স্বোপার্জিত বিত্তগত নয়।

৩. ১৮৫১ সালের ১১ ডিসেম্বরের হাইকোর্টের নথিভুক্ত মোক্তারনামা; ১৮৫২ সালের ১২ জুলাইয়ের 'সংবাদ সাগর' পত্রিকার মন্তব্য। রাসমণির পক্ষে ডিক্রি দেওয়া হয়েছিল এবং মথুরবাবু 'পুনর্মুষিকবৎ' হয়েছিলেন। তখন স্ত্রীকে নিয়ে মথুরবাবু জানবাজারের প্রাসাদ ছেড়ে ফরাসডাঙ্গায় চলে গিয়েছিলেন। পরে অবশ্য রাসমণি গিয়ে তাঁদেরকে স্বগৃহে ফিরিয়ে আনেন।

৪. গৌরাঙ্গ ঘোষ, 'রাজেশ্বরী রাসমণি', পৃ ১৫৮

৫. 'সংবাদ প্রভাকর', ৩১ জুলাই ১৮৫৬

৬. গৌরাঙ্গ ঘোষ, পূর্বোক্ত

৭. হিতেশরঞ্জন সান্যালের প্রবন্ধ 'Temple-Building in Bengal from the Fifteenth to the Nineteenth Century', *Perspectives in Social Sciences I* (ed. Barun De)

৮. অন্নভোগ শূদ্রের পারিবারিক দেবতার প্রসাদী অন্ন। ব্রাহ্মণ পুরোহিত কর্তৃক দেবতার কাছে উৎসর্গীকৃত ও দেবতার 'আস্বাদিত' অন্ন। অপরের গৃহে অন্নগ্রহণ নিয়ে সে-যুগে লোকে কঠোরভাবে জাতপাতের বিচার করত। উৎসবাদি উপলক্ষ্যে নিমন্ত্রিত হলেও নিমন্ত্রণকর্তার ঊর্ধতন ছয় পুরুষের জাতপাতের বিবরণ দিতে হতো। আত্মীয়-স্বজনের সামাজিক অবস্থানেরও খোঁজখবর নেওয়া হতো। এই যখন দেশের অবস্থা, তখন একজন কৈবর্ত রমণীর প্রদত্ত অন্ন বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণরা গ্রহণ করবে তা ভাবা বাতুলতামাত্র। তবুও রাসমণি নিশ্চয়ই আশার বিরুদ্ধে আশা করেছিলেন যে, উঁচু ও নিচু উভয় বর্ণের দ্বারা পূজিতা 'জাগ্রতা' এক দেবীর প্রসাদী অন্ন হয়ত বর্ণহিন্দুরা কিছুটা দ্বিধার সঙ্গে হলেও গ্রহণ করবেন।

মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন সমাগত প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে একটি করে রেশমী বস্ত্র, উত্তরীয় ও স্বর্ণমুদ্রা দান করেছিলেন।

৯. অনুরূপ কয়েকটি স্বপ্নাদেশের জন্য রেভারেন্ড ওয়ার্ড-এর *A view of the History, Literature and Mythology of the Hindus* ও রেভারেন্ড লঙ-এর *Handbook of Bengal Missions* গ্রন্থ দুটি দ্রষ্টব্য

১০. প্রমথনাথ গাঙ্গুলী, 'স্বামী বিবেকানন্দ', ২য় খণ্ড, পৃ ৮১১

উমা

আত্মা পরমাত্মা

নিশীথ চৌধুরী

['উৎস মানুষ আড্ডা'র নজরকাড়া আড্ডাবাজ ছড়াকার নিশীথ চৌধুরী উৎস মানুষ ছাড়াও আরো কিছু পত্রিকায় লিখেছেন। কল্যাণগড় থেকে প্রকাশিত 'সম্প্রীতি'-প্রসঙ্গ পারলৌকিক ক্রিয়া (যুক্তির নিরীখে) পুস্তিকা থেকে সংগৃহীত।]

১

আত্মা পরমাত্মা
কোথায় যে তার পাত্তা জানো?
ফেলছে যেন নিঃশ্বাস, অন্ধ
এসব বিশ্বাস মানো!

২

ভূতের বাড়ী শ্মশানতলা
তিড়িং বিড়িং নাচে
বিচ্ছু ছেলে বললো
এসে—ভয়ের কি বা আছে?
ভূতের সাথে পাঞ্জা লড়ি
ভূতে কিসের ভয়?
সত্যি কথা বল্‌ছি শোনা
ওসব কিছু নয়।

৩

নানা রকম খাদ্য, বড়বাবুর
শ্রাদ্ধ।
খাচ্ছে হাজার লোক, ওদের
বেজায় শোক
বললো ছেলে কান্তি—
'এতেই আছে শান্তি'।

৪

বাবা যখন বেঁচেছিলেন
করি নি তার খোঁজ,
মারা গেলেন—বাবার
শোকে
দিলাম বড় ভোজ।
বললো সবাই—'গুণের
ছেলে ক'জন এমন হয়,'
মিথ্যে শোকের ভণ্ডামিতে
সমাজ করি জয়।

৫

নবীনবাবু মারা
গেছেনপঁচিশ বছর আগে,
আজও 'নবীন আত্মা' নাকি
রাত্রি হ'লে জাগে।
সংস্কারের ঝাণ্ডা হাতে
এগিয়ে চলে দেশ,
ভ্রান্তি নিয়ে আত্মা নিয়ে
চল্‌ছে আহা বেশ।

৬

আত্মা ভূতের ছড়াছড়ি—
গল্প ছবি নাটকে,,
মানুষ ধ'রে
ঢুকিয়ে দে রে
অবিজ্ঞানের ফাটকে।

উমা

সময় যে কারও নাই

আশীষ লাহিড়ী

সময় কারও যে-নাই গানটি রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছিলেন ২৮ নভেম্বর ১৯২১। গানের কথাগুলি এইরকম:

> সময় কারো যে নাই, ওরা চলে দলে দলে—
> গান হায় ডুবে যায় কোন্ কোলাহলে।।
> পাষাণে রচিছে কত কীর্তি ওরা সবে # বিপুল গরবে,
> যায় আর বাঁশি-পানে চায় হাসিছলে।।
> বিশ্বের কাজের মাঝে জানি আমি জানি
> তুমি শোন মোর গানখানি।
> আঁধার মথন করি যবে লও তুলি # গ্রহতারাগুলি
> শোন যে নীরবে তব নীলাম্বরতলে।।
>
> (প্রেম/''গান'', কাফি কানাড়া-দাদরা)

গীতা ঘটকের গায়নে অমর হয়ে থাকলেও, গানটি প্রচলিত অর্থে খুব জনপ্রিয় নয়। অর্থাৎ রবীন্দ্রসঙ্গীত বিপণন সার্কিটের গুটি পঞ্চাশ গানের প্যাকেজের মধ্যে পড়ে না। কী বলতে চাইলেন রবীন্দ্রনাথ গানটির মধ্যে দিয়ে?

প্রথম দুটি লাইনের মধ্যে বিশেষ জটিলতা নেই, নতুনত্বও নেই। চারপাশের ব্যস্ত পুঁজির জীবনে প্রতিটি মুহূর্ত ছক-কাটা। যে-সময়টুকু টাকা রোজগারের জন্য বিনিয়োগ করা হয় না, সেটা অপব্যয়।

সাহিত্য, দর্শন নিয়ে, এমনকী তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে পড়াও সময়ের অপব্যয়। কিন্তু ম্যানেজমেন্ট কিংবা আইটি নিয়ে পড়াটা সময়ের সুবিনিয়োগ। সময়=ভবিষ্যৎ=কেরিয়ার=টাকা। কথাটা বহুশ্রুত। ১৯২১ সালেও, আজও। ব্যক্তিমানুষকে যন্ত্রের ছাঁচে পিষে মারার বিরুদ্ধেই তো চার্লি চ্যাপলিন বিদ্রোহ করেছিলেন তাঁর *মডার্ন টাইম্‌স*-এ।

কিন্তু প্রশ্ন জাগে এ গানের তৃতীয় আর চতুর্থ লাইনের তাৎপর্য নিয়ে। 'ওরা' মানে ওই ওয়াল-দালাল স্ট্রীটের লোকেরা, তাতে সন্দেহ নেই। ওদেরই ফাটানো বাজি আপনাকে নিরিবিলিতে গান শোনার অবকাশ দেয় না। সেটা স্পষ্ট। কিন্তু ওরা 'পাষাণে' কোন্ কীর্তি রচনা করে যার গর্বে কবির প্রাণের বাঁশির দিকে চেয়ে 'হাসি ছলে' ওদের বিদ্রূপ করতে বাধে না?

এর কিছুটা উত্তর পাওয়া যাবে বিশ্বভারতীর জন্য টাকা তোলার উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথের ব্যর্থ ইউরোপ-আমেরিকা ভ্রমণের ইতিহাসে। 'আমেরিকায় দীর্ঘ সাড়ে চারটি মাস মোটামুটি হতাশাজনক অবস্থায় কাটিয়ে রবীন্দ্রনাথ সপরিবারে' আমেরিকা ত্যাগ করেন ১৯ মার্চ ১৯২১। হতাশাজনক কেন? ১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ''ছার'' উপাধি ত্যাগ করেছিলেন বলে ইংরেজ কূটনীতিকরা আমেরিকায় রবীন্দ্র-বিরোধী প্রচারে যথেষ্ট সক্রিয় ছিল, ফলে বিশ্বভারতীর জন্য যে-পরিমাণ টাকা তোলার আশা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, তার ভগ্নাংশও পূর্ণ হয়নি। এক কথায়, জাত গেছে, পেট ভরেনি।

আমেরিকা থেকে ইংল্যান্ড পৌঁছলেন ৩১ মার্চ। আবার আশা, এবার বুঝি 'কিছু' মিলবে। হাউস অব কমন্‌স-এ মহদাশয় ব্রিটিশ কর্তারা 'তাঁর বিশ্বভারতী পরিকল্পনার প্রতি উৎসাহ প্রকাশ' করেছেন দেখে তিনি উল্লসিত। এবার নিশ্চয়ই বিশ্বভারতীর টাকার অভাব মিটবে। কিন্তু ঘোর ভাঙতে দেরি হল না। কয়েক দিনের মধ্যেই লিখলেন, 'আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য কমিটি বানানোর প্রবক্তারা বলেন, ওর শেকড়ের দরকার নেই, দরকার পাকা বনিয়াদের'। অর্থাৎ ওদের টাকা নিতে গেলে ওদের হুকুম মেনে চলতে হবে, তার সঙ্গে তাঁর শিক্ষা-পরিকল্পনার সম্পর্ক থাক বা না-থাক। তাঁর শিউরে-ওঠা প্রতিক্রিয়া —এদের কাছে খাঁচাটাই চিরস্থায়ী, বাসাটা নয় (The cage is permanent, not the nest)। ২৪ এপ্রিল ১৯২১ তীক্ষ্ণ ভাষায় তাঁর বন্ধু রোদেনস্টাইনকে লিখলেন, শান্তিনিকেতন 'যে আপনাদের কারখানার যন্ত্রঘরে অতি নিখুঁতভাবে যন্ত্রে-কোঁদা একটা জিনিস নয়, এজন্য আমি গর্বিত—শান্তিনিকেতন আমাদের সব হতে আপন।...এতদিনে আমি বুঝতে পারছি যে আমি বড়োলোক পশ্চিমের দ্বারে নীত হয়েছিলুম আদর্শের টানে নয়, জাগতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার টানে।...অত্যন্ত প্রভাবশালী আর অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ট্রাস্টিবোর্ডের সঙ্গে আমি কোনো দিনই তাল মিলিয়ে চলতে পারব বলে মনে হয় না।...দুনিয়ার যারা প্রতিপত্তিশালী, এই পৃথিবীর যারা প্রভু, তারা আমাকে আমার মতো কাজ করতে দেবে না। এ আমি জানি। আমার শান্তিনিকেতনের অভিজ্ঞতায়, আর আমেরিকা ভ্রমণের অভিজ্ঞতায় এর পরিচয় আমি পেয়েছি'।[১] অতঃপর ১৬ জুলাই ১৯২১ ভারতে ফিরলেন।

এর মাস দেড়েক পর থেকে একেবারে ভিন্ন মেজাজের একটি কাব্যধারার সূচনা করলেন। অক্টোবর-নভেম্বর ১৯২১-এ লেখা কবিতাগুলি *শিশু ভোলানাথ* নাম দিয়ে সংকলিত হল ১৯২২-এ। ১৯২৪-এ আবার ভ্রমণে বেরোলেন রবীন্দ্রনাথ। এবার দক্ষিণ আমেরিকা। ৭ অক্টোবর হারুনা মারু জাহাজে বসে লিখছেন, 'কিছুকাল আমেরিকার প্রৌঢ়তার মরুপারে ঘোরতর কার্যপটুতার পাথরের দুর্গে আটকা পড়েছিলুম। সেদিন খুব স্পষ্ট করে বুঝেছিলুম, জমিয়ে তোলবার মতো এতবড়ো মিথ্যে ব্যাপার জগতে আর কিছুই নেই। ... কিছুকালের জন্য আমি এই বস্তু-উদ্‌গারের অন্ধযন্ত্রের মুখে এই বস্তুসঞ্চয়ের অন্ধভাণ্ডারে বদ্ধ হয়ে আতিথ্যহীন সন্দেহের বিষবাষ্পে শ্বাসরুদ্ধপ্রায় অবস্থায় কাটিয়েছিলুম। তখন আমি এই ঘন দেয়ালের বাইরের রাস্তা থেকে চিরপথিকের পায়ের শব্দ শুনতে পেতুম। ...আমি সেদিন স্পষ্ট বুঝেছিলুম, আমি ওই পথিকের সহচর। আমেরিকার বস্তুগ্রাস থেকে বেরিয়ে এসেই 'শিশু ভোলানাথ' লিখতে বসেছিলুম'।[২]

এই 'পাথরের দুর্গ' আর 'ঘোরতর কার্যপটুতা'-র সরাসরি অনুরণন পাই আলোচ্য গানের 'পাষাণে রচিছে কত কীর্তি ওরা'-র মধ্যে। আর ঠিক তার বিপরীত সুরটা ফুটে উঠেছে *শিশু ভোলানাথ*-এর মধ্যে। *শিশু ভোলানাথ*-এর প্রধান সুরটা হল সময়ের বাঁধাবাঁধি থেকে মুক্তি। 'সময়হারা' কবিতায় আছে এরকম লাইন—

কত ঘণ্টা, কত মিনিট, সময় আছে যত
শেষ যদি হয় চিরদিনের মতো,
তখন স্কুলে নেই বা গেলেম; কেউ যদি কয় মন্দ,
আমি বলব, ''দশটা বাজাই বন্ধ''।
তাধিন তাধিন তাধিন।

সময়কে মুনাফায় রূপান্তরিত করবার সাধনায় নিযুক্ত পুঁজির সংগঠনশক্তি ব্যক্তিমানুষের স্ব-ইচ্ছাকে, সৃজনশীলতাকে, যাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'বাঁশি', কানাকড়িও মূল্য দেয় না। পুঁজিতন্ত্রের সেই সর্ব-নিষ্পেষণকারী সঙ্ঘশক্তিকেই রবীন্দ্রনাথ পাষাণে রচিত কীর্তি বলে ধিক্কার জানিয়েছেন। এরই চলচ্চিত্ররূপ আমরা দেখি চার্লি চ্যাপলিনের *মডার্ন টাইম্‌স*-এ।

কিন্তু এর পাশাপাশি ছিল অন্য এক যন্ত্রণা। পুঁজিতন্ত্রের নিরবকাশ পাষাণমূর্তি দেখে তাঁর অন্তরাত্মা শুকিয়ে আসছিল, অন্যদিকে নিজের দেশের মানুষের সঙ্গে তৈরি হচ্ছিল দুস্তর দূরত্ব। গান্ধীজীর চরকা-প্রেমের প্রকাশ্য বিরোধিতা করায় তিনি দেশের গরিষ্ঠ অংশের বিপরীত মেরুতে চলে গিয়েছিলেন। খুবই তীব্র হয়ে উঠেছিল রবীন্দ্র-বিরোধিতার সুর। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ লিখেছেন— 'বিরোধের কথা, প্রতিবাদের কথা সহজেই কানে এসে পৌঁছয়। ...পপুলারিটি বিচারের সময়ে তো এদের ভোটকে নামঞ্জুর করার জো নেই—গলার আওয়াজ এদেরই সংখ্যাধিক্য বলে ভুল হওয়া আশ্চর্য নয়'।[৩]

এ চিঠির উত্তর রবীন্দ্রনাথ দেন ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯২১— 'কিছুদিন থেকে নিজের অন্তরের মধ্যে তাকাতে প্রবৃত্ত হয়েছি—আর সেই সঙ্গে নিজের খেলায় হাত দিয়েছি—এ হচ্ছে আমার আজন্মকালের ছেলেমানুষী, আশা করি আমৃত্যুকাল চল্‌বে—এই আমার কবিতা লেখার খেলা। ...এর আর কোনো উদ্দেশ্য নেই—এ কেবল নিজের আদিকালের মধ্যে নিজেকে পাবার চেষ্টা'।[৪]

আর এইদিনই লিখলেন 'সময় কারো যে নাই'। পাঠক, আর কোনো কথা নয়, এবার মগ্ন হয়ে শুনুন গীতা ঘটকের কণ্ঠে সেই গান।

---

১. প্রশান্তকুমার পাল, রবিজীবনী, ৮/৯৪, আনন্দ ২০০০। 'I am proud of the the fact that it [Santiniketan] is not a machine-made article perfectly modelled in your workshop — it is our very own. ... Now I am beginning to discover that it was more an ambition than an ideal which dragged me to the gate of the rich West. ... And I am being punished deep in my heart. ... Very likely I shall never be able to work in harmony with a board of trustees, influential and highly respectable, for I am a vagabond at heart. But the powerful people of the world, the lords of the earth, may make it difficult for me to carry out my work. I know it, and I had experience of it in connection with my Shanti Niketan and also in my tour in America.'

২. পশ্চিমযাত্রীর ডায়েরি, রবীন্দ্র রচনাবলী, প ব সরকার, ১৯৬১, ১০/৫৬৫-৫৬৬। ৩. কল্যাণীয়েষু প্রশান্ত (সম্পা প্রশান্তকুমার পাল) পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০৪, পৃষ্ঠা ১০

৪. ওই পৃষ্ঠা ১১

উমা

সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া পত্রিকার কোনও অংশের কোনও মাধ্যমের সাহায্যে কোনওরকম পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এই শর্ত না মানলে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। — সম্পাদকমণ্ডলী

মানুষ ডাক্তার বনাম যন্ত্র ডাক্তার

গৌতম মিস্ত্রী

বিশ্বের এককোণে পৃথিবী নামের একটি অকিঞ্চিৎকর গ্রহে আধুনিক ও বুদ্ধিমান মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য চেতনার আঙ্গিনায় একের পর এক বিপ্লব ঘটে চলেছে। দুই লক্ষ বৎসর আগে পূর্ব-মধ্য আফ্রিকায় আধুনিক মানুষের উদ্ভব হলেও ভাষা ও চিন্তন বিপ্লব, কৃষি বিপ্লব, বৈজ্ঞানিক বিপ্লব, প্রযুক্তি বিপ্লব ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলি মানুষের ঐতিহাসিক সময়-রেখাচিত্রে (Time-Line) একদম সাম্প্রতিক ঘটনা। এইসব বিপ্লবগুলি সাধারণ ও বুদ্ধিমান অসাধারণ আপামর মানুষ উদ্দীপনার সাথে হজম করে বেড়াচ্ছিল এতদিন পর্যন্ত। সাধারণ নয়, এবার বুদ্ধি গুলিয়ে ওঠা, অসাধারণের চিন্তা এই যে—নবতম প্রযুক্তি, কৃত্রিম বুদ্ধির যন্ত্র (Artificial Intelligence) বুঝি এমন শক্তিধর যে, সেটা মানুষের বদহজমের কারণ হতে পারে।

এইরকম ধ্যানধারণার চমকের খবরের আভাস আজকাল খবরের কাগজের খবর হচ্ছে। সেটা পুরোপুরি বোঝা না গেলেও এটা বেশ বোঝা যাচ্ছে, এই যান্ত্রিক বুদ্ধির বিপ্লবটা বোধহয় আপাতদৃষ্টিতে বিতর্কিত ও কারোর মতে ১২,০০০ বৎসর আগে উদ্ভাবিত অবাঞ্ছিত কৃষিবিপ্লবের মতো। এদিকে চাইলেও ইতিহাসে ফিরে যাবার উপায় নেই। বিতর্কিত হলেও যান্ত্রিক বুদ্ধি বিপ্লব কাঙ্ক্ষিত প্রযুক্তি কী? সোজাসাপ্টা উত্তর নেই। যন্ত্রের বুদ্ধিতে নির্ভরশীল হলে মানুষের দেহ আর মন সাময়িক খাটুনি থেকে ছুটি পায়। বিনিময়ে যে কিছু মূল্য দিতে হয়, সেটা অনেক সময়ে হিসাবে আসে না।

ক্যালকুলেটার উদ্ভাবনের আগে মানুষের মনে মনে অঙ্ক কষার একটা ক্ষমতা অর্জন হয়েছিল প্রয়োজনের চাপে। সেই চাপ বহুদিন হল আর নেই। কৃষকের বে-রোজগেরে ম্যাট্রিক ফেল ছেলে তার হাতের মোবাইল যন্ত্রে বিনে পয়সার ক্যালকুলেটার ব্যবহার করে এক নিমেষে ৭৩৫ টাকা কিলো দরে বিকানো ইলিশ মাছ বাছাই করে ২ কিলো ৩৫০ গ্রাম মাছের দাম নির্ভুলভাবে জেনে নিচ্ছে মগজ না খাটিয়ে। কেবল বাজারের ফুটপাতে হাঁসের ডিম আর কচুর লতি বিক্রি করেন যে প্রৌঢ়া আর নিরক্ষর বিধবা মহিলারা, যাঁরা কেবল কুড়ি অবধি গুনতে পারেন—তাঁদের ক্যালকুলেটার নেই। তাঁরা মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে শেখেন নি। তাঁরা কিন্তু ক্যালকুলেটার বা স্মার্ট ফোন ছাড়াই ব্যবসা করে খাচ্ছেন কেবল মানুষের সহজাত মাথার ব্যবহার করে। হাঁসের ডিম বা কচুর লতি না কিনলেও আপনি বেঁচেবর্তে থাকবেন, মারা যাবেন হাঁসের ডিম আর কচুর লতি বিক্রি করা বাজারের ফুটপাতে বসে থাকা নিরক্ষর বুদ্ধিমান বিধবা মহিলারা।

তিন দশক আগে বাপির চানাচুর জনপ্রিয় ছিল। হলুদের গুঁড়ো বেচে সচ্ছল, ভারতীয় পশ্চিমী সওদাগরের এক নাতি বাপিকে এলিট বাঙালির বাজার থেকে হটিয়ে চানাচুর বেচে ইদানীং আমির হয়েছেন। তার ছেলেকে চানাচুর বিক্রির ব্যবসায় মানায় না। ভূমিপুত্র বাপি চানাচুরের মালিক চানাচুর বেচে অত বেশি টাকা কামাতে পারে নি, যতটা পশ্চিমী ভুজিয়াওয়ালারা পেরেছে। হলুদের গুঁড়ো আর ভুজিয়ার ব্যাপারি, পশ্চিমী সওদাগরের ছেলেমেয়েরা নিষ্কর্মা থাকলেও ক্ষতি ছিল না। একটানা টাকার গদিতে নিষ্কর্মা বসে থাকলে মনটা খিঁচখিঁচ করে। থোরাসা ইমান ভী চাহিয়ে! মান বা ইমান আজকাল অর্থমূল্যে বিক্রি হয়। ডাক্তার হবার জন্য কেবল কড়িই যথেষ্ট। ক্যাপিটেশন ফি দিয়ে সুযোগ পেয়ে পাশ করা ডাক্তারদের সঙ্গে মেধার ভিত্তিতে সস্তায় পাশ করা ডাক্তারদের একটা মানের পার্থক্য থাকলেও বাজারে সোনা আর ভূষিমালের ফারাক হিসাবে আসে না।

চিকিৎসার বাজারে মগজওয়ালা ডাক্তারের মগজের ফসলের কোনো আলাদা পারিশ্রমিক হয় না। অল্পবুদ্ধি অর্থমূল্যে ডাক্তার হওয়া ডাক্তারদের চাহিদা কর্পোরেট বাজারে সমধিক। ডাক্তারের মগজ ধারালো হলে হাসপাতালের ক্ষতি। কর্পোরেট হাসপাতালে ডাক্তারের সার্টিফিকেট দরকার, তার বুদ্ধি নয়। পেটে ব্যথা হলে পেটের স্ক্যান করে রোগ ধরা পড়ল না। কারণটা যে হার্ট ফেলিওর সেটা বোঝা গেল খরচ সাপেক্ষ NT Pro BNP রক্ত পরীক্ষা, হার্টের ইকোকার্ডিওগ্রাম আর করোনারি অ্যাঞ্জিওগ্রাম করে। হাসপাতালে এই ধরনের ঘটনাগুলো বেশ আমোদের। প্রথম সাক্ষাতে, কেবল মগজ খাটিয়ে সেটা বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বুঝে নিতে পারবে এমন আবদার করা এখন কেবল অন্যায় নয়, বেসরকারি হাসপাতালে অবাঞ্ছিত।

প্রযুক্তির অগ্রগতি মানুষের সুবিধা করে কিছু আপোসের

বিনিময়ে, ক্যালকুলেটারের উদাহরণটা স্মরণ করুন। গ্রামেগঞ্জে ডাক্তার, কবিরাজ, কম্পাউন্ডার, টেকনিশিয়ানের হাতে ফেরে সস্তার ইসিজি মেশিন। আধুনিক ইসিজি মেশিন হৃদস্পন্দনের রেখাচিত্র রেকর্ড করে নিমেষে, সম্ভাব্য হৃদরোগের নাম ছাপিয়ে দেয়। গ্রামের অবৈতনিক স্কুলের মিড-ডে মিলের মানের স্বাস্থ্য শিবিরও অনুষ্ঠিত হয়। যার জন্য স্কুলের খরচ কিছুই নয়, সরকারের কোষাগারেও চাপ পড়ে না। অবৈতনিক স্কুলের সুস্থ কিশোর-কিশোরীদের পাইকারিভাবে ইসিজি করে কার লাভ বা কার ক্ষতি অস্পষ্ট থাকে না। ছিপে টোপ ফেলে অপেক্ষায় থাকে স্বেচ্ছাসেবীর মুখোশে ইসিজি মেশিনে সজ্জিত কর্পোরেট হাসপাতালের দালাল। ষোল বছরের সাবিনা খাতুনের ইসিজি-তে একটা বুড়ো বয়সের হার্টের রোগের উল্লেখ করা আছে দেখে ইসিজি টেকনিশিয়ান ইকোকার্ডিওগ্রাম করতে বলেন। কোনো ডাক্তারের মগজ সেই ইসিজি মেশিনের ভুল ধরার জন্য থাকে কী? থাকলেও ডাক্তার ভুল ধরতে পারেন কি? আর পারলেও তাঁকে সেটা করতে দেওয়া হত কি? জানি না।

মেশিনের ভুল ধরার উপায় থাকলেও হয়ত নাটকের স্ক্রিপ্ট একই রকম হত। কিছু ক্ষেত্রে এই নাটক করোনারি অ্যাঞ্জিওগ্রাম অবধি চলে। ছদ্ম-স্বেচ্ছাসেবী বেসরকারি হাসপাতালের লাভ হয়। আর্থিক ও মানসিক ক্ষতি হয় সরলমতি সাবিনা খাতুনদের। একটু খেয়াল করলে দেখা যাবে, সেই সব ইসিজি রিপোর্টের নিচে ছোট করে ছাপা থাকে 'আনুমানিক রিপোর্ট'; ডাক্তার লাগবে ভুল শোধরানোর জন্য।

হবু ডাক্তারদের পাঠক্রম ছয় বৎসব থেকে কমে এখন সাড়ে পাঁচ বছর হয়েছে, যার মধ্যে শেষ এক বছর ইন্টার্নশিপের জন্য বরাদ্দ। যন্ত্রনির্ভর ডাক্তারি পাঠক্রমে যন্ত্রের রোগ নির্ণয় ক্ষমতা যাচাই করার প্রশিক্ষণে ফাঁকি থেকে যায়। বরং বলা ভাল, সেই শিক্ষা দেবার মাস্টার মেলে না। ডাক্তারি শিক্ষার শিক্ষকও যে শেখেন নি সেই বিদ্যা!

লেখকের অভিজ্ঞতায় ইসিজি মেশিনের নির্ভুল হৃদরোগ ২০ শতাংশের বেশি নয়। পড়ে থাকা ভুল রোগের তকমা আঁটা নির্দোষ, সরলমতি সম্পূর্ণ সুস্থ মানুষগুলো ইকোকার্ডিওগ্রাম, ট্রেড মিল টেস্ট, করোনারি অ্যাঞ্জিওগ্রাম ইত্যাদি করে মাঝে মধ্যে নিষ্কৃতি পান—চড়া মূল্যের আর্থিক ও মানসিক ক্ষতি স্বীকার করে। তৃতীয় বিশ্বের মানুষ চাঁদে মহাকাশযান নির্ভুলভাবে নামাতে পারলেও, কোনও এক অজানা কারণে, একবিংশ শতাব্দীতে কম জটিল ইসিজি মেশিনকে দিয়ে নির্ভুল কাজ করানো যাচ্ছে না। বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির অগ্রগতির জন্য অর্থনীতি, রাজনীতি আর ধর্মীয় অনুমোদন লাগে, সেটা কে না জানে! মহাকাশ প্রযুক্তি সূর্যের দিকে ধাবিত হয়, স্বাস্থপরিষেবামূলক প্রযুক্তি অতীতকে আঁকড়ে ধরে পিছনের দিকে হাঁটে।

প্রশিক্ষিত চিকিৎসকের মগজের অভাব আধুনিকতম যন্ত্র পূরণ করতে পারে না। প্রশিক্ষণের ফারাকে বিশাল ফারাকওয়ালা মানুষের মগজের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা স্বীকার করে নিলেও বলা যায় মানুষ ও যন্ত্রের এই অসম ক্ষমতায় বেসরকারি হাসপাতাল উল্লসিত হয়, রোগ নির্ণয়ে বেশি পরীক্ষানিরীক্ষার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। হাসপাতালের ব্যবসায় বেশি লাভ হয়।

এইগুলো তো তাৎক্ষণিক লাভ লোকসানের হিসেবনিকেশ। দীর্ঘমেয়াদি লাভক্ষতির হিসেবটা অবিতর্কিতভাবে ভয়ংকর। ঠিক হোক বা ভুল হোক, অনিশ্চিত হলেও ভারতের মতো এখনও অনুন্নত দেশে ইসিজি মেশিনের ছাপানো রিপোর্টে অভ্যস্ত ছাত্র-ডাক্তার যন্ত্রের রিপোর্ট যাচাই করার প্রেরণা পান না, শিক্ষক-ডাক্তার যন্ত্রের রিপোর্ট যাচাই করার প্রশিক্ষণ পান না। ক্রমশ ইসিজি রেখচিত্র থেকে হৃদরোগ নির্ণয়ের মন্ত্রগুপ্তি ভুলতে থাকেন। টেলি-প্রম্পটার বিগড়ে গেলে রাজনীতিবিদও খেই হারিয়ে বাক্যহারা হয়ে বিদ্রূপের খোরাক হন। কে যেন বলেছিল, যন্ত্র আমাদের দিয়েছে 'বেগ', কেড়ে নিয়েছে 'আবেগ'। মসলিন তৈরির কারিগরের বিলুপ্তিতে যেমন মসলিন-শিল্প বিলুপ্ত হয়েছে, ইসিজি-র রেখাচিত্র বিশ্লেষণের প্রশিক্ষণের বিলুপ্তিতে একটা বিনে পয়সার, ঝটিতি হৃদরোগ নির্ণয় ক্ষমতাও বিলুপ্ত হয়েছে।

স্মার্ট ফোন, গুগল্ ইত্যাদি হকেরকম ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান মানুষের মগজকে বিনে পয়সার বিশ্রাম দিয়ে আমাদের অগোচরে কয়েদি করেছে মেধাধারীদের। লেখার সময় আমাদের আর শব্দের বানান, অর্থ, প্রয়োগবিধি নিয়ে মাথা ঘামাতে হয় না। মাথা না ঘামানোটাই যে মরণসম সে কথাটা কে বোঝাবে! স্মার্ট ফোনের স্পর্শদোষ এড়ানো/বঞ্চিত নিরক্ষর নিষ্পাপ অর্থনৈতিক দুর্বল মানুষগুলো পার পেয়ে যান।

ইদানীংকালে রেডিও, টেলিভিশন, খবরের কাগজ, ফেসবুক ইত্যাদি জনপ্রিয় গণমাধ্যমের একটি ঘোষণায় জানা যাচ্ছে, গন্ডায় গন্ডায় মেডিকেল কলেজ খুলছে, আরো খুলবে।

সেখানে স্রেফ মাল্লু ফেল ডিগ্রি নাও ডাক্তার হও। তারপর ডান পায়ের অপারেশন দরকারে মামুলি ভুলে বেখেয়ালে বাম পায়ে অপারেশন করলে আগের মতো ডাক্তারের উপরে কোনো চাপ নেই। চিকিৎসকের অবহেলায় রোগী মরলে ভ্রান্ত, অবহেলিত চিকিৎসা পরিষেবা প্রয়োগের কাণ্ডারি চিকিৎসক ও হাসপাতাল এখন নতুন ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (The Bharatiya Nyaya (second) Sanhita, December 2023) আইনের চোখে এখন নির্বিষ মামুলি অপরাধী। চিকিৎসা পরিষেবাকে প্রথমে বিচারালয়ে জবাবদিহি, অপরাধী সাব্যস্ত করার আইন বলবৎ করা ও চিকিৎসা পরিষেবাকে উপভোক্তা বনাম পরিষেবা সমীকরণে পড়ে গেলে প্রথমে রোগী-চিকিৎসকের বিশ্বাসের সেতুটা নড়বড়ে করা হয়ে ছিল। রোগী-চিকিৎসকের বিশ্বাসের বাতাবরণ আর নেই। রোগী-চিকিৎসকের সম্পর্কের বাজারি মনোমালিন্যের নজরদারির জোর কমে গেল প্রযুক্ত হওয়ার অপেক্ষায় থাকা নব্য ভারতীয় ন্যায় সংহিতা আইনের খসড়ায়।

এবার থেকে পাবলিকের লুটের টাকায় অজস্র মেডিকেল কলেজ খুলবে। সরকারি হাসপাতালে মরণাপন্ন মানুষ ভর্তি হবার সুযোগ না পেলেও, ভি আই পি কুকুরের ডায়ালেসিস করা হয়। অধুনা আপামর অস্বচ্ছল মানুষের রোগভোগের চিকিৎসায় শিখণ্ডী নব্য পয়দা হওয়া তরুণ ডাক্তার চিকিৎসা প্রযুক্তি প্রয়োগের লাইসেন্স পেয়ে শহরের স্টার মার্কা অত্যন্ত ব্যয়বহুল হাসপাতালে দিনরাত মরণাপন্ন রোগীর হয়ে যমের সঙ্গে যুদ্ধ করে কর্পোরেট হাসপাতালের খিদে মিটিয়ে, কোনোমতে আপন অস্তিত্ব বজায় রেখে মাঝে মধ্যে রোগীকে বাঁচিয়ে দেন মহার্ঘ মূল্যে।

কেন্দ্রীয় সরকারি নজরদারি ও নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা মেডিক্যাল কাউন্সিল অব ইন্ডিয়ার (আই এম এ) নতুন সংস্করণ ন্যাশনাল মেডিক্যাল কাউন্সিল (এন এম সি) ইন্ডিয়ান মেডিকেল আই এম এ যে অসাম্য আর দুর্নীতির অবসান ঘটাবে সেটা নিয়ে সংশয় বেড়ে গেল।

তথ্যসূত্র ঃ

১) Sapiens, Yuval Noah Harari, 2015, Pages 422-423.
২) স্বাস্থ্যের সন্ধানে অথবা অসুস্থতার খোঁজে, দেবাশিস মুখার্জী, চার্বাক, ২০২৩, পৃ৩২-৩৫।
৩) https://scroll.in/latest/1060894/medical-negligence-will-be-decriminalised-in-draft-criminal-law-says amit-shah

উ মা

বাড়ি থেকে পালিয়ে

অরুণালোক ভট্টাচার্য্য

ঘটনা এক — সময়টা গত বছরের জানুয়ারি মাস। পাকিস্তানের করাচির কোরাঙ্গি অঞ্চলের দুটি মেয়ে নিখোঁজ হয়ে গেল। তাদের একজনের বয়স ১৩, অন্যজন ১৪। তদন্তের ভারপ্রাপ্ত অফিসার আব্রেজ আলি আব্বাসি কন্যাদ্বয়ের ডায়েরি ঘাঁটতে গিয়ে আবিষ্কার করলেন এক আশ্চর্য তথ্য। দক্ষিণ কোরিয়ার বিখ্যাত পপ্ ব্যান্ড বি টি এস-এর সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য তারা অনেকদিন ধরেই পরিকল্পনা করছিল। সেই পরিকল্পনার যাবতীয় ব্লু প্রিন্ট ছিল সেই ডায়েরিতে। কোরিয়ার উদ্দেশ্যে যাওয়ার জন্যই তাদের গৃহত্যাগ। শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানি পুলিশের তৎপরতায় তাদের উদ্ধার করা হয় লাহোর থেকে। বিধ্বস্ত অবস্থায়। স্বপ্নরথের ব্যর্থ উড়ান।

ঘটনা দুই — একে ঠিক ঘটনা বলা যায় না। বরং একটি উপন্যাসের নির্যাস। মনোমলিন্যের জেরে, কাঞ্চন বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিল বিনোদের সঙ্গে। শিবরাম চক্রবর্তীর 'বাড়ি থেকে পালিয়ে' কিশোর উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৯৪৬ সালে। শিবরাম তাঁর ছেলেবেলায় বহুবার বাড়ি থেকে পালিয়ে গেছেন। হয়ত সেই অভিজ্ঞতারই ফসল তাঁর এই উপন্যাস। উপন্যাসের শেষে কাঞ্চন ফিরে আসে তার বাড়িতে। সুস্থ অবস্থায়।

ঘটনা তিন—১৭০৬ সালে, আমেরিকার বস্টন শহরের মিল্ক স্ট্রিটে, ফ্র্যাঙ্কলিন পরিবারে যে শিশুটি জন্মেছিল, তার বাবার ইচ্ছে ছিল যে ছেলেটি বড় হয়ে চার্চের কাজে তার জীবিকা নির্বাহ করুক। সেই উদ্দেশ্যে তাকে ভর্তি করা হল ধর্মযাজকদের স্কুলে। কিন্তু অর্থাভাবে মাত্র ১০ বছর বয়সেই তার স্কুল শিক্ষায় ইতি। সে তার সৎভাই জেমস্-এর ছাপাখানায় কাজে যোগ দিল। কিন্তু সেখানেও মতান্তর। কিশোর ফ্র্যাঙ্কলিনের ঐ ছাপাখানা থেকে প্রকাশিত কাগজে লেখার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হল। ফ্র্যাঙ্কলিন বস্টন থেকে পালিয়ে চলে এলেন ফিলাডেলফিয়া। তার পরের ঘটনা তো ইতিহাস। বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন একাধারে লেখক, বিজ্ঞানী, উদ্ভাবক, রাষ্ট্রনায়ক, কূটনীতিবিদ, মুদ্রক, প্রকাশক, রাজনৈতিক দার্শনিক এবং বহুবিদ্যাজ্ঞ বা polymath। বাড়ি থেকে পালিয়ে স্বপ্নের উড়ান।

উপরের তিনটি ঘটনা থেকে এটা বোঝা যাচ্ছে যে, বাড়ি

থেকে পালিয়ে যাওয়ার প্রবণতা কোনও দেশ, কাল, লিঙ্গ, ধর্মের বেড়াজালে সীমাবদ্ধ নয়। মানুষ যেদিন যূথবদ্ধ হতে শুরু করেছে এবং তার মননে বহিরঙ্গের স্বাধীন চেতনা রঙিন হতে শুরু করেছে, তখন থেকেই মানুষ পালাতে শিখেছে। হয় নিজের সত্তায় অসহিষ্ণু হয়ে, নয়তো পরিবারের অসহনীয় পরিবেশের উপর খাপ্পা হয়ে। উপরের উদাহরণে সব কটি ক্ষেত্রেই মধুরেণ সমাপয়েৎ। কিন্তু অনেক সময়েই বাড়ি থেকে পালানোর পরিণতি খুব সুখের হয় না।

কারণাবলী — পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটলেও তার কার্যকারণ আলাদা। সেগুলি বেশিরভাগই নির্ভর করে সেই দেশ বা সমাজের আর্থসামাজিক অবস্থার উপরে। উন্নত দেশগুলিতে বাড়ি থেকে পালাবার প্রধান কারণ হল পারিবারিক অশান্তি। সে বাবা-মায়ের মনোমালিন্য বা শিশুদের শারীরিক নিগ্রহ বা সৎ বাবা-মার চরম অবহেলা— যাই হোক না কেন। দ্বিতীয় কারণটি হল মাদক। সেটি মদ থেকে শুরু করে ড্রাগ, যাই হোক না কেন। তৃতীয় কারণটি হল স্কুলজ। সেখানে লেখাপড়ায় পিছিয়ে পড়ার গ্লানি থেকে শুরু করে সহপাঠীদের ঠাট্টা-টিটকিরি-অপমান বা শিক্ষকদের অবহেলা। সর্বশেষ কারণটি বোধহয় আর্থিক। যেখানে টাকাপয়সার অভাবে দৈনন্দিন জীবনযাপন প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে।

যদি আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশের কথা ভাবা যায়, তাহলে আর্থিক দুরবস্থাটি পর্যায়ক্রমের প্রথমেই স্থান নিয়ে নেবে। ভারতের মানব-পাচার বিরোধী সংস্থার (anti-human trafficking unit) একটি পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, প্রায় ৪৭ শতাংশ ছেলেমেয়ে পড়াশোনার চাপে বা প্রেমাহত হয়ে বাড়ি ছাড়ে। বাকিদের বেশিরভাগই অন্যান্য শহরের চাকচিক্যময় জীবনযাত্রার মরীচিকায় গৃহত্যাগী হয়। খুব অল্পসংখ্যক ছেলেমেয়ে ঘর ছাড়ে পারিবারিক সমস্যা বা স্কুলজনিত কারণে। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে যে, আমাদের দেশে বা প্রাচ্যে যে কোনও কারণেই তারা বাড়ি ছেড়ে চলে যাক না কেন, পশ্চাৎপটে অভিভাবকদের মানসিকতাই মুখ্য হয়ে ওঠে। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। শিবরাম চক্রবর্তীর কথাই ধরা যাক। শিবরামের বাবা শিবপ্রসাদ ছিলেন রাজসম্পত্তির অধিকারী। বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও শিবপ্রসাদ এবং শিবরামের মা দুজনেই ছিলেন আধ্যাত্মিক জগতের মানুষ। জাগতিক ব্যাপারে তাঁরা ছিলেন অদ্ভুতভাবে নির্লিপ্ত। শিবরামের প্রতি অপত্য স্নেহেও সেই নির্লিপ্ততার ধূসর ছায়া। ফলত শিবরামও ছোটবেলা থেকে স্বভাব বাউণ্ডুলে। মাঝে মাঝেই বাড়ি থেকে পালিয়ে যান মুক্তির স্বাদ পাওয়ার তাগিদে। আজ সমুদ্র তো কাল পাহাড়ে। ফিরে আসার পরেও বাবা-মা নির্বিকার। যেন সন্তানের অস্তিত্ব নিয়ে তাঁদের কোনও হেলদোল নেই। পরিবেশের এই আবহেই শিবরাম একদিন পাকাপাকিভাবে ঘর ছাড়লেন।

বাড়ি থেকে পালানোর সঙ্গে মানসিক বৈকল্যের সম্বন্ধ— বিষয়টাকে এইভাবে ভাবা যেতে পারে। যাদের মধ্যে বাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়ার প্রবণতা রয়েছে, তারা কি মানসিকভাবে অসুস্থ? বা যারা শিশুকালে বাড়ি থেকে পালিয়ে গেল, তাদের বয়সকালে তারা কি কেউ মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল? যারা বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়, তাদের মধ্যে স্বল্প শতাংশ মানসিকভাবে সুস্থ নয়। তাদেরই মানসিকভাবে অসুস্থ বলতে পারি যারা সামাজিক বা দেশের আইন ভেঙে বাড়ি থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। বা বাড়ি থেকে পালিয়ে তারা এমন কিছু কাজকর্ম করে বেড়াচ্ছে, যা পরিবার, সমাজ বা শিক্ষাদীক্ষার ক্ষেত্রে প্রভূত ক্ষতিসাধন করছে। সেইসব কিশোর বা যুবক যারা বারংবার বাড়ি থেকে পালিয়ে একই ধরনের কাজ করে চলেছে। তাদের ভুল ধরিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও তাদের বিন্দুমাত্র অনুতাপ হয় না। তারা যে অন্যের দুঃখ-কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে, সেই বোধোদয়ও তাদের হয় না। তাদের কার্যকলাপ যে তাদের নিজস্ব বেড়ে ওঠার পরিপন্থী, সেই ধারণাও তাদের গড়ে ওঠে না। ফলত তাদের মনের লাগামছাড়া মানসিকতার জন্য বদ্যির প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

বাড়ি থেকে পালানোর ঘটনায় বিশেষভাবে লক্ষণীয়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বালক বা কিশোর বা যুবক শব্দগুলি ব্যবহার করা হয়েছে। তার কারণ হল, প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আগে যারা বাড়ি থেকে পালিয়ে যাচ্ছে, তাদের প্রায় দুই তৃতীয়াংশই পুরুষ।

এবারে দেখা যাক, বাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়ার প্রবণতাযুক্ত কিশোর-কিশোরীরা যখন প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে ওঠেন, তাঁরা কি মানসিক ভারসাম্যহীন হয়ে পড়েন? শিশুকালে মনের খেয়ালে বা হঠকারিতার বশে যাঁরা বাড়ি থেকে পালিয়েছেন, তাঁদের বেশিরভাগই বড় হয়ে সুস্থ, স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ফিরতে পারেন। কিন্তু যাঁদের মধ্যে মনোরোগের লক্ষণাবলী প্রকট, তাঁরা প্রাপ্তবয়স্ক হয়েও অসামাজিক ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়ে বসেন। পরিভাষায় যাকে Anti-social personality disorder বলা হয়। একটি গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, প্রাপ্তবয়স্ক মনোরোগীদের শতকরা পঁচিশ থেকে ষাট ভাগই ছোট বয়সে

মানসিক বৈকল্যের শিকার ছিলেন। এঁদের অনেকেই বড় হয়ে ভয়ানক ডিপ্রেশন, মাদকাসক্তি, আত্মহত্যা প্রবণতা, অবাঞ্ছিত গর্ভধারণ, কর্মবিমুখতা এবং অন্যান্য মনোরোগের কবলে পড়েন।

প্রতিকার — বাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়ার প্রবণতার বেশিরভাগটাই আবেগপ্রবণতা বহিঃপ্রকাশ। এটি যদি তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হয়, তবে দুশ্চিন্তা কম। কিন্তু যদি সেটি মনের গভীরে বাসা বাঁধা কোনও ব্যারামের লক্ষণ হয়, তাহলে চিকিৎসা খুব সহজ নয়। এই রোগ কোনও পেট খারাপের মতো রোগ নয়, যে সাতদিন ওষুধ খেলেই সেরে উঠবে। এই রোগের চিকিৎসা করতে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার প্রয়োজন। চটজলদি এর কোনও সুরাহা নেই।

চিকিৎসার মূল উপকরণ হল psychological বা মনোসামাজিক এবং behavioural বা আচরণগত চিকিৎসা। এর ওপরে প্রয়োজন বুঝে ওষুধ প্রয়োগ করতে হবে। বাড়ি থেকে পালিয়ে যদি কোনও ব্যারামের প্রাথমিক লক্ষণ বলে মনে করা হয়, তাহলে তার চিকিৎসাও দ্রুত শুরু করলে ভালো হয়। দেরিতে চিকিৎসা শুরু হলে, রোগ তার শিকড়ের ডালপালা ছড়িয়ে মনের মধ্যে গেড়ে বসে। তাকে সমূলে উৎপাটন করা তখন খুব মুস্কিলের ব্যাপার। আমরা দেখেছি, বাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়ার আপাত কারণ যাই থাকুক না কেন, পরিবার এবং বাবা-মার ভূমিকা সেখানে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। তাই এর চিকিৎসাও বাবা-মা বা পরিবারকে নিয়েই সার্বিকভাবে সম্পন্ন হওয়া উচিত। নচেৎ ফলাফল প্রত্যাশিত মানে না-ও পৌঁছতে পারে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে হয়ত বাবা-মা বা অন্যান্য গুরুজনদেরও চিকিৎসার প্রয়োজন হয়। শৈশবে পরিবেশ এবং প্রতিবেশী দুই-ই পরিবর্তনশীল। বাড়ি এবং প্রতিবেশী ছাড়াও স্কুল-কলেজ-বন্ধুবান্ধব-মাস্টারমশাই সব মিলিয়ে এক অদ্ভুত বৈচিত্রময় জগৎ। সব সামলে অটলভাবে চিকিৎসা প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে সঠিক পরিকল্পনার প্রয়োজন। সবশেষে উল্লেখ্য, এই জাতীয় চিকিৎসায় ওষুধের ভূমিকা অত্যন্ত নগণ্য এবং তূনীরের শেষ বাণ। নেহাৎ বেকায়দায় না পড়লে, ব্যবহার করতে নেই।

শেষের কথা — যারা বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়, তাদের সবার পরিণতি খুব সুখের হয় না। যারা স্বপ্ন দেখে বাড়ি থেকে পালায়, তাদের সবাই বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন বা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হয়ে উঠতে পারে না। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরোর (এনসিআরবি) সাম্প্রতিক তথ্য অনুসারে ভারতে ৪৭,০০০-এরও বেশি শিশু নিখোঁজ রয়েছে, যার মধ্যে ৭১.৪ শতাংশই নাবালিকা। যদিও এর মধ্যে অপহরণ, বিতাড়ন, বাড়ি থেকে পালানো সবই আছে। যাদের খোঁজ পেয়ে জীবনের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনা গেল, তাদের কথা বাদ দিলে পড়ে থাকে কিছু দুর্ভাগা, যাদের স্বপ্নভঙ্গ হয়ে স্থান হয়—ভিক্ষাবৃত্তি, পতিতাবৃত্তি, মাদক পাচার, মাদকাসক্তি, শিশু শ্রমিকের অন্ধকার জীবনে।

পরিস্থিতির গুরুত্ব বিচার করে, ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক, ভারতের জাতীয় মানবাধিকার কমিশনারের তত্ত্বাবধানে শিশু ও নারী পাচার বন্ধ করার জন্য বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছেন। তবুও মন। পলাতক সিনেমার বসন্ত চাটুজ্জে মনের খবর কিছুতেই খুঁজে পায় না। চিরকাল সে তাই বারমুখো, পলায়নপর। ক্যাচ মি ইফ ইউ ক্যান ছবিতে ফ্রাঙ্ক অ্যাবগ্নেল জুনিয়ার। তাঁর বাবা-মার বৈবাহিক জীবন অত্যন্ত খারাপ হওয়ায়, জুনিয়ার ঠগবাজিতে সিদ্ধহস্ত হয়েছিলেন। জীবনের অনেকটা সময়ই তাঁর কেটে গিয়েছিল জেলখানা আর সংশোধনাগারে। তাই বাড়ি থেকে পালানোর প্রবণতা দেখতে পেলে সবার আগে সজাগ হতে হবে বাবা-মাকে। প্রয়োজনে তাঁদের আত্মশুদ্ধি ঘটাতে হবে। ডাক্তার বদ্যি পুলিশ মনোবিদরা সহায়ক হিসাবে থাকবেনই। তবেই বাড়ি থেকে যারা পালাবে, তাদের ফিরে আসার একটা সম্ভাবনা থাকবে। সে বাড়িতেই হোক বা জীবনের মূল স্রোতে।

উমা

কেন্দ্রীয় সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন নিয়মাবলির (১৯৫৬) ৮ ধারা অনুযায়ী নিম্নলিখিত জ্ঞাতব্য বিষয় প্রকাশিত হল

১। প্রকাশস্থান : বি ডি ৪৯৪, সল্ট লেক, কলকাতা - ৭০০০৬৪

২। প্রকাশকাল : ত্রৈমাসিক

৩। প্রকাশক : বরুণ ভট্টাচার্য্য

৪। মুদ্রক : নিউ জয়কালী প্রেস

৫। মুদ্রণস্থান : দীনবন্ধু লেন, কলকাতা-৭০০০০৬।

৬। সম্পাদক : সমীরকুমার ঘোষ, ৫২/৫১, শশীভূষণ নিয়োগী গার্ডেন লেন, কলকাতা- ৭০০০৩৬।

আমি বরুণ ভট্টাচার্য্য এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে, উপরোক্ত তথ্যগুলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

১ মার্চ, ২০২৪ বরুণ ভট্টাচার্য্য
প্রকাশক

রবীনদা

(১৯৪৬ - ২০২৪)

শংকর ঘটক

রবীনদার সঙ্গে প্রথম পরিচয় বিজ্ঞান কলেজের অঙ্গনে, সত্তরের দশকের গোড়ার দিকে। আমরা তখন ছাত্র। রবীনদা ধানবাদে খ্যাতনামা বিজ্ঞানী দুর্গাদাস লাহিড়ীর তত্ত্বাবধানে গবেষক ছাত্র। এই পর্যায়ের গবেষণা শেষ করে ডক্টর রবীন্দ্রনাথ মজুমদার, বিজ্ঞান কলেজের ফলিত রসায়ন বিভাগে শিক্ষকতার কাজে যোগ দিলেন। সম্পর্কটা আরও কাছের হয়ে গেল। সেই সম্পর্কটা বজায় ছিল শেষ দিন পর্যন্ত। শুধু আমার নয়, রবীনদার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল অসংখ্য মানুষের। যে কোনো মানুষকে আপন করে নেবার মহৎ ক্ষমতা ছিল রবীনদার। এটাই ওঁর অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এর সাথে যুক্ত হল সমাজ-ভাবনা। শুধুমাত্র অধ্যাপনায় ব্যাপৃত না রেখে নিজেকে ছড়িয়ে দিলেন সমাজের বৃহত্তর ভাবনার জগতে। নিছক বিজ্ঞান গবেষণা সমাজের সার্থক বিকাশ ঘটাতে সক্ষম নয়, প্রয়োজন বিজ্ঞানমনস্কতার উৎকর্ষ সাধন। সমাজ বিচ্ছিন্ন বিজ্ঞান গবেষণা ছোট্ট একটি সম্প্রদায়ের মুনাফা বৃদ্ধির নিশ্চিত সহায়ক নিঃসন্দেহে; কিন্তু বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মুক্তির অন্যতম পথ বিজ্ঞানমনস্কতার প্রসার বা বিকাশ—বিশ্বাস করতেন রবীনদা। সেই বিশ্বাসের থেকেই জন্ম নিল 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞামকর্মী', সহযোগী একগুচ্ছ সমমনস্ক মানুষ। সেই সময়টাকে আমরা চিহ্নিত করতে পারি ভাবনা চিন্তায় আলোড়নের একটি তৃণমূলক স্বল্পস্থায়ী পর্যায় হিসেবে। বেশ কয়েকটি সংগঠন আর প্রকাশনার জন্ম হল তখন। তারই একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক 'উৎস মানুষ'। উৎস মানুষের সঙ্গে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মীর প্রতিযোগিতামূলক মিষ্টি বন্ধুত্বের সম্পর্ক রবীনদা সোচ্চার উপভোগ করতেন।

বিজ্ঞান বইয়ের পাতায় বন্দি করে রাখার বিষয় নয়, বিজ্ঞানকে আত্তীকরণ করাটাই আসল। কথাটা বলা যত সহজ, অভ্যাস করাটা ততটাই কঠিন। তাই আমরা দেখি তাত্ত্বিকভাবে ঈশ্বরের অস্তিত্বে সম্পূর্ণ অবিশ্বাসী অক্লেশে ধর্মাচরণ করেন। রবীনদাকে কখনই আমরা সেই পথে হাঁটতে দেখি নি। নিজ দর্শন যাপনে অবিচল আমৃত্যু। অপ-বিজ্ঞান বিরোধিতায় স্থিরপ্রতিজ্ঞ, গণবিজ্ঞান আন্দোলনের একনিষ্ঠ সৈনিক রবীনদা স্বাভাবিক নিয়মেই ছিলেন প্রতিষ্ঠান বিরোধী। দীর্ঘ গবেষণা করেছিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ওপর। পুস্তকাকারে প্রকাশিত সেই কাজ সুধীমহলে প্রশংসিত। রবীনদা আজ নেই, তাঁর কাজ রয়ে গেছে আমাদের কাছে। রবীনদাকে স্মরণ করা বা রবীনদার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা তখনই সার্থক হবে যখন তাঁর অসম্পূর্ণ কাজ আমরা সম্পূর্ণ করার চেষ্টা করব। সর্বদা সজাগ থাকতে হবে যাতে ব্যক্তির পথচলা শেষ হলে যেন তাঁর দর্শনেরও মৃত্যু না ঘটাই আমরা। সম্মানের সঙ্গে আমরা যেন তাঁকে বিদায় জানাতে পারি, অসম্মানের শেষ যাত্রা বড়ই বেদনার।

রবীনদার বিজ্ঞানমনস্কতা স্রেফ কথার কথা ছিল না। আদর্শের প্রতি নিষ্ঠায় ওঁর এতটুকুও ফাঁকি ছিল না। ব্যক্তিগত আচরণেও যার প্রতিফলন ছিল। গণবিজ্ঞান আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় মানুষটির এই একরোখা মানসিকতা অনেককেই গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। কিন্তু আমরা বেদনার সঙ্গে লক্ষ্য করলাম প্রয়াত রবীন্দ্রনাথ মজুমদারের মতো বিজ্ঞানমনস্ক ও যুক্তিবাদী মানুষ অনেকেই মরণোত্তর দেহদানে অঙ্গীকারবদ্ধ ছিলেন। কিন্তু পরিবারের প্রবল আপত্তিতে তাঁদের ভেতর বেশ কয়েকজনের শেষ ইচ্ছা পূরণ করা যায় নি। **উমা**

ভুল সংশোধন

জানুয়ারি-মার্চ ২০২৪ সংখ্যায় 'কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, তার উৎস মানুষই' —পাতা ২৯ শেষ প্যারায় ১৭ শতাংশ ছাপা হয়েছে, হবে ৯৭ শতাংশ। অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

গত ছ'বছরে মুম্বাই শহরে মেট্রো রেল, বুলেট ট্রেন ও সমুদ্রের ধার দিয়ে রাস্তা নির্মাণ করতে ২১০২৮ গাছ কেটে ফেলা হয়েছে। খবরটি বেশ উদ্বেগজনক।

দি ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস ২৬.৩.২০২৪

ঘরের চাবি পরের হাতে

লক্ষ্মীর (তথ্য) ভাণ্ডার

জিতেন নন্দী

১

লক্ষ্মীবালা সরদার, ওরফে লক্ষ্মী। আমাদের প্রতিবেশী। আমাদের পাড়া রবীন্দ্রনগরের খালপাড়ে ওদের বাড়ি। ওর ঠাকুর্দা সপরিবারে এখানে এসেছিলেন হাওড়া জেলার শ্যামপুর থেকে। বাবার নির্দিষ্ট কোনো পেশা ছিল না। যখন যেমন পাওয়া যেত—কখনো ভ্যান চালাতেন, কখনো ঘরে টালি ছাওয়ার কাজ করতেন। বাবা-মায়ের আট মেয়ে আর এক ছেলে। লক্ষ্মীর এক বোন ছোটবেলায় গ্যাস বেলুনের গ্যাস পেটে গিয়ে মারা গেছে। এখন ওরা ভাইবোন মিলে বেঁচে আছে আটজন। সবার বিয়ে-থা হয়ে গেছে। ছেলেপুলেও আছে। লক্ষ্মীর এক মেয়ে, রবীন্দ্রনগর বালিকা বিদ্যালয়ে পড়ে। তিন পুরুষের বাস এখানে। বাপের আমল থেকে ওদের ভোটার কার্ড ছিল, রেশন কার্ড ছিল। ওদের গুষ্টির কারও জন্ম-সার্টিফিকেট নেই। ধাইয়ের হাতেই ওদের পৃথিবীর আলো দেখা। লক্ষ্মী স্কুলেও যায় নি। ওর দুই বোন আর এক ভাই কিছুদিন স্কুলে পড়েছিল। লক্ষ্মী লোকের বাড়িতে ঠিকে কাজ করে। স্বামী ছিল মদ্যপ, একটা গ্রিলের কারখানায় কাজ করত। লকডাউনের মাঝে ২০২১ সালে হঠাৎ এক রাত্রে সে মরে গেল। যেটুকু রোজগার ছিল তার, মদেই চলে যেত। লক্ষ্মীই সংসারটা চালাত। তিনটে পেটের বদলে দুটো পেট রইল। তার ওপর পাওয়া গেল মাসে মাসে এক হাজার টাকা করে বিধবা ভাতা। মাসে মাসে আর একটা উপরি রোজগার তো ছিলই, লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের পাঁচশো টাকা। ২০১২ সালে আধার কার্ড পাওয়া গিয়েছিল সহজেই, একেবারে বিনি পয়সায়। ভোটার কার্ড পাওয়ার জন্য যেটুকু যাচাই করে নেওয়ার পদ্ধতি ছিল, আধার কার্ডে তাও ছিল না। কিন্তু লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের জন্য লক্ষ্মী জিরো ব্যালান্স অ্যাকাউন্ট খুলল আমাদের পাড়াতেই, বরোদা ব্যাঙ্কের গ্রাহক সেবা কেন্দ্রে। বেহালার পর্ণশ্রীতে সেই বরোদা ব্যাঙ্কের শাখা। নাম জিরো ব্যালান্স অ্যাকাউন্ট, কিন্তু খাতা খুলতে নগদ সাতশো টাকা খরচ করতে হল। ব্যাঙ্কের খাতায় ৫৫০ টাকা জমা হল আর গ্রাহক সেবা কেন্দ্রকে দিতে হল ১৫০ টাকা। সঙ্গে দিতে হল আধার নম্বর। আর মোটেই জিরো ব্যালান্স রাখলে চলবে না, অ্যাকাউন্টে কম করে দেড় হাজার টাকা ব্যালান্স থাকতে হবে অথচ সরকার বলেছিল: জিরো ব্যালান্স অ্যাকাউন্ট। যেন বিনি পয়সার ভোজ! ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ভগবান হয়ে এই নিচের তলার মানুষের মাথায় হাত রেখেছিলেন। এসেছিল প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা। মোদিজি শ্লোগান তুললেন, 'মেরা খাতা, ভাগ্যবিধাতা'! 'তোমার আঙুলের ছাপই ব্যাঙ্ক। দশ বছরের বাচ্চাও জনধন প্রকল্পে অ্যাকাউন্ট খুলতে পারে। জিরো ব্যালান্স অ্যাকাউন্টের হাতছানিতে কাতারে কাতারে মানুষ অ্যাকাউন্ট খুলেছে। যার অ্যাকাউন্ট দরকার নেই, সেও খুলেছে। যে পরিবারে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ছিল না, তাদের পাঁচটা ব্যাঙ্কের খাতা হয়েছে। যে পরিবারে কোনো ফোনই ছিল না, সেখানে এল হাতে হাতে মোবাইল ফোন! লক্ষ্মীর একার নামে কোনো ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ছিল না। বিয়ের আগে ওর মায়ের সঙ্গে জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট ছিল স্টেট ব্যাঙ্কে। আর ওর স্বামীর সঙ্গে কানাড়া ব্যাঙ্কে একটা খাতা ছিল। এবার নিজের নামে আলাদা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট হল। আধার কার্ড করার সময় ঘরে কোনো মোবাইল ছিল না। ২০১৬-১৭ সাল নাগাদ ওদের একটা ছোট মোবাইল ফোন হল। আসলে সরকার চাইছিল, লোকে খেতে পাক আর না-পাক, মাথার ওপর ছাদ থাকুক আর নাই থাকুক, তার চৌহদ্দির মধ্যে ব্যাঙ্কের শাখা যদি নাও থাকে, প্রত্যেক লোকের আধার কার্ড, মোবাইল ফোন আর ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে—কম-সে-কম জিরো ব্যালান্স অ্যাকাউন্ট।

তিনবার করে মেটিয়াবুরুজের পোস্ট অফিসে গিয়ে লাইন দিয়েও লক্ষ্মীর আধার-মোবাইল লিঙ্কিং হল না। অবশেষে পাড়ায় একটা ক্যাম্পে ৬০ টাকা খরচ করে সমস্যা মিটল। এখন ওর লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা, বিধবা ভাতা অনায়াসেই জমা হয়ে যাচ্ছে ব্যাঙ্কে। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত মিনি ব্যাঙ্কের দরজায় বিরাট ভিড়। সেই ভিড় ঠেলে বায়োমেট্রিক মেশিনে আঙুলের ছাপ দিয়ে দেদার লোকে টাকা তুলছে। লক্ষ্মী তো নিরক্ষর, নামটুকুও সই করতে পারে না। মোবাইলে মেসেজ এলে দেখে পড়তে পারে না। কাজে-অকাজে লোককে সাধতে হয় মেসেজ পড়ে দেওয়ার জন্য, হাতেপায়ে ধরতে হয় একটা ফর্ম ভরার জন্য, কখনো হয়ত দশ-বিশ টাকা হাতে গুঁজেও

দিতে হয়। পাড়ায় স্টেট ব্যাঙ্ক, কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক, বন্ধন ব্যাঙ্কের শাখা আছে। কিন্তু লক্ষ্মীর মতো নিরক্ষর লোকেরা সেখানে ঢুকতে ভয় পায়। ফর্ম ফিলাপ করতে লোককে সাধতে হয়। কম টাকার লেনদেন সেখানে হয় না। কখনো কখনো ব্যাঙ্কের কর্মচারীদের মুখও শুনতে হয়। আর মোদি-ম্যাজিকে অনেক আরাম! আধার-নির্ভর পেমেন্ট সিস্টেমে (Aadhaar enabled payment system, AEPS) ব্যাঙ্কে না ঢুকেও আনপড় লোকে ব্যাঙ্কে টাকা রাখছে, আধার নম্বর আর বায়োমেট্রিকে আঙুলের ছাপ দিয়ে দেদার টাকা তুলছে।

২

আমাদের পাড়ার বাড়িওয়ালা মধ্যবিত্ত-উচ্চবিত্তরা অনেকেই নিজেরা লাইনে দাঁড়িয়ে রেশন তোলে না। লক্ষ্মীর মতো গরিবদের ফি-হপ্তা রেশনের চাল-গম দিয়ে দেয়। সবাই অবশ্য মাগনা দেয় না। কেউ কেউ বিক্রিও করে—ফ্রি রেশনের চালের রেট আগে ছিল দশ টাকা কেজি, এখন পঁচিশ টাকা। যাদের নিজেদের রেশন কার্ড নেই, এটুকু পেলেও কিছুটা সাশ্রয়। কিন্তু প্রতি মাসে লক্ষ্মীকে যে নিজের কার্ডের রেশন তুলে দেয়, লোকটা বুড়ো, প্রায়শ তার আঙুলের ছাপ মেশিনে মেলে না, চোখের মণির ছবিও মেলে না। তখন মোবাইল ফোনে ওটিপি আসে, সেই নম্বর মিলিয়ে তবে রেশনের স্লিপটা হাতে পায় লক্ষ্মী। রেশনের দোকানে এ এক নিত্য বিড়ম্বনা।

শৈশবে ওর মা আটটা সন্তানের পেট ভরাতে পারত না। ওরা ভাইবোনেরা জলা-জঙ্গল-গঙ্গার ধারে শাকপাতা, ফলমূল, শাপলা কুড়িয়ে বাড়িয়ে খেয়ে বড় হয়েছে। ওর মা মেয়েদের ছোট বয়স থেকেই বিনা মাইনেতে খাওয়া-পরার বিনিময়ে লোকের বাড়িতে কাজ করতে পাঠিয়েছে। লোকে ওদের দেখলে ভালো করে কথাও বলত না। এখন কাজের লোকের খুব ডিমান্ড। তাই লোকে ওদের দেখলে মিষ্টি করে কথা বলে। কিন্তু এখন বোধহয় লক্ষ্মীর অবস্থার একটু উন্নতি হয়েছে। মেয়ের টিউশনির পেছনে ভালোই খরচ করতে হয়। লকডাউনের সময় মেয়ের বায়নায় একটা স্মার্টফোন কিনে দিতে হয়েছে। স্কুলের টাস্ক আসবে অনলাইনে। মেয়ের জন্য একটা জিরো ব্যালান্স অ্যাকাউন্টও খুলতে হয়েছে। এখন স্কুলে বলছে মেয়েরও প্যান কার্ড লাগবে। আগে লাগত ৬০ টাকা, এখন প্যান কার্ড করতে খরচ ২০০ টাকা আর আধার লিঙ্ক করতে আরও ৩০০ টাকা। পুরসভা থেকে মেয়ের শিডিউল কাস্ট সার্টিফিকেটও পাওয়া গেছে। আগামী দিনে হয়ত মেয়ের কন্যাশ্রীও পাওয়া যাবে। আর সরকারি এতসব পাওনাগণ্ডার জন্য ডকুমেন্ট তো লাগবেই! অতীতে ওদের পরিচয়ের কাগজপত্র বলতে ছিল ভোটার আর রেশন কার্ড। এখন ওদের কাছে অনেক ডকুমেন্ট। সব ডকুমেন্টই আধারের সঙ্গে লিঙ্কড। লক্ষ্মী আর এখন ততটা চালচুলোহীন লক্ষ্মীছাড়া নয়।

৩

যেদিন খবরে জানা গেল, একজনের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে পরপর তিনবার দশ হাজার টাকা করে মোট ত্রিশ হাজার টাকা বেরিয়ে গেছে, লক্ষ্মীরাও জানল তা। মিনি ব্যাঙ্ক বা গ্রাহক সেবা কেন্দ্র থেকে প্রতিবারে দশ হাজার টাকা পর্যন্ত তোলা যায়। আর মূল ব্যাঙ্কের শাখা থেকে সরাসরি দশ হাজার টাকার কম তোলা যায় না (স্টেট ব্যাঙ্কে)। তাই গ্রাহক সেবা কেন্দ্রের এত জনপ্রিয়তা। আমাদের নিকটবর্তী সন্তোষপুর স্টেশনে ২নং প্ল্যাটফর্মে একটা টুলের ওপর চলছে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের গ্রাহক সেবা কেন্দ্র। গ্রামেগঞ্জেও এভাবে আধার নম্বর আর বায়োমেট্রিক মেশিনে আঙুলের ছাপ দিয়ে লেনদেন চলছে। সারা দেশে এখন প্রতি মাসে ৪০-৫০ লক্ষ ট্রানজাকশন বা লেনদেন চলছে আধার নম্বরের মাধ্যমে। এই জালিয়াতি অর্থাৎ সাইবার ফিনান্সিয়াল ফ্রডও চলছে সমানতালে। ২০২২ সালে সারা দেশে জালিয়াতি করে ব্যাঙ্কের টাকা আত্মসাৎ হয়েছিল মোট ২২৯৬ কোটি টাকা; এ বছর এখন পর্যন্ত ৫৫৭৪ কোটি টাকা। এ হল সরকারি হিসেব। সরকার লেনদেনের এই নয়া ব্যবস্থাকেই মনে করছে সকলের উন্নতি, সবকা বিকাশ!

জি-২০ মহাসম্মেলনে বিশ্বব্যাঙ্ক একটা রিপোর্ট পেশ করেছিল ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩, এতে প্রধানমন্ত্রী জনধন, আধার এবং মোবাইলের মাধ্যমে ভারতের আর্থিক অন্তর্ভুক্তির হার গত ছয় বছরে ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে বলে ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি টুইটারে লিখেছিলেন, 'যে বৃদ্ধিতে পৌঁছাতে কমপক্ষে ৪৭ বছর লেগে যেত, আমরা ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচারের মাধ্যমে ছয় বছরে টার্গেট ছুঁয়ে ফেলেছি।'

পাঁচ বছর আগের হিসেব অনুযায়ী সারা বিশ্বে ১৭০ কোটি মানুষ ব্যাঙ্ক-পরিষেবার আওতার বাইরে ছিল। তাদের কোনো ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ছিল না। ভারতের মতো দেশে বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলে যেখানে ব্যাঙ্কের শাখা নেই অথবা নামমাত্র আছে, ডাকঘরও হয়ত নেই, পাকা রাস্তাঘাট নেই, ইলেকট্রিক ও

ইন্টারনেট যোগাযোগ সকলের নেই, বহু মানুষ নিরক্ষর, সেখানে ব্যাঙ্কের আওতায় মানুষকে, বিশেষত মেয়েদের নিয়ে আসার প্রকল্প হল আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কর্মসূচি, ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের ভাষায় এটা হল Financial Inclusion। সরকার সাধারণ মানুষকে অন্ধকারে রেখে তাদের নানান প্রলোভন দেখিয়ে আধার-গ্রাহক হতে বাধ্য করেছে। অথচ আধার ঐচ্ছিক, বাধ্যতামূলক নয়। প্রায় দেড় দশক যাবৎ সমস্ত কিছুর সঙ্গে আধার লিঙ্কিং-এর পর্ব চলছে। জন্ম-মৃত্যু সার্টিফিকেট, বিবাহ-নথিভুক্তি, স্কুলে ভর্তি, কলেজে ভর্তি, স্কলারশিপ, মিউচুয়াল ফান্ডে লেনদেন, যাবতীয় পেমেন্ট সিস্টেম, ডিজিলকার, রেশন কার্ড, জব কার্ড, প্যান কার্ড, জিএসটি, বিকলাঙ্গতা পরিচয়পত্র, ভোটার পরিচয়পত্র, ব্যাঙ্ক, মোবাইল, পাসপোর্ট, ড্রাইভিং লাইসেন্স, জমির দলিল ...যে কোনো মামুলি জিনিস পেতে গেলেও আধারের বেড়া ডিঙোতে হবে। সরকারি, বেসরকারি অফিস-আদালত-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হাজিরা দিতে গেলে আধার, এমনকি সরকারি হাসপাতালে এক্স-রে, আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করতে গেলে আধার নম্বর দিতে হচ্ছে। অতএব, এটা দ্রুত এমন এক ব্যাপার হয়ে উঠেছে যখন এটা প্রত্যাখ্যান করলে অথবা কোনো কারণে পেরে না উঠলে লোকে সেখান থেকে বাদ পড়ে যাবে।

আধার আজ সর্বত্র বিরাজমান। জালিয়াতদের কিছুটা ধন্যবাদই জানাতে হয়। কারণ জাল আধার, ডুপ্লিকেট আধার, আধার ব্যবহার করে তথ্য-চুরি আর জালিয়াতির অজস্র ঘটনাকে সরকার কখনোই যথাযথ গুরুত্ব দেয় নি। জালিয়াতরাই দেখিয়ে দিয়েছে যে আধার কতটা অনির্ভরযোগ্য পরিচয়-পত্র। বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি ডেটাবেস বা তথ্যভাণ্ডারে আধার-সংযুক্তির মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে এক কেন্দ্রীকৃত তথ্যভাণ্ডার, যাকে বলা যেতে পারে বিগ ডেটা।

লক্ষ্মীর মেয়ের লেখাপড়ায় মন নেই। সাজতে ভালবাসে, রান্না করতে ভালবাসে—রোজকার ভাত-রুটির পাশাপাশি চাউমিন-পিৎজা বানাতেও জানে। তবে ওর মন স্মার্টফোনে। লক্ষ্মীর মেয়ের মতো ছেলেমেয়েরা দিনরাত মোবাইল দেখছে। কিন্তু ওরা জানে কি মোবাইলও ওদের দেখছে? ওদের গতিবিধি সেখানে ডেটা আকারে সঞ্চিত হচ্ছে ওদের অজান্তেই। মোবাইলে চব্বিশ ঘণ্টা ওদের পছন্দের নানান কিছুর উদার আমন্ত্রণ। এইভাবে আধার, ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট, মোবাইলের মাধ্যমে একত্রিত হয়ে চলেছে ডেটা। কোথা? কার ঘরে?

৪

বিগ ডেটা ক্রমপুঞ্জিভূত হয়ে চলেছে বিগ ব্রাদারের হেফাজতে। বিগ ব্রাদার ইজ ওয়াচিং ইউ, বিগ ব্রাদার তোমায় অনুসরণ করছে। কে এই বিগ ব্রাদার? একসময় ভাবা হয়েছিল হিটলার, স্তালিন, ইদানীংকালে ডোনাল্ড ট্রাম্প কিংবা নরেন্দ্র মোদি...। কিন্তু এখন বিগ ডেটার ক্রমপুঞ্জিভবনে জন্ম নিয়েছে ডেটা ক্যাপিটাল। যন্ত্রবুদ্ধি-প্রযুক্তির বলে বলীয়ান এই পুঁজির নিয়ন্ত্রক গুগ্‌ল, ফেসবুক, মাইক্রোসফট্, অ্যামাজনের মতো কর্পোরেট কোম্পানি।

আধার নিয়ে এক অসাধারণ গবেষণামূলক গ্রন্থ Dissent on Aadhaar, Big Data meets Big Brother-এর সম্পাদক রীতিকা খেরা ২০১৯ সালে লিখেছিলেন, 'কোনো কেন্দ্রীকৃত তথ্যভাণ্ডারই সুরক্ষার দিক থেকে সম্পূর্ণভাবে নির্ভরযোগ্য হতে পারে না। আর 'আধার'-এর মতো প্রকল্পে তো অনন্য পরিচয়জ্ঞাপক সংখ্যা (Unique identity number)-এর মাধ্যমে যেন শতাধিক তালা খোলার ক্ষমতাসম্পন্ন একটা চাবিকাঠি কারও হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

আজ কি পদে পদে সেই সত্যই প্রমাণিত হচ্ছে না?

উ মা

পাঠক ও গ্রাহকদের প্রতি আবেদন

লেখালিখি উৎস মানুষ পত্রিকার প্রয়াত সম্পাদক অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখার সংকলন। গত বইমেলায় সংকলনটি নিঃশেষিত হয়। লেখালিখি-র দ্বিতীয় সংস্করণ-এর কাজ শুরু করা হয়েছে। প্রথম সংস্করণ প্রকাশ করে আমরা পাঠকদের জানিয়েছিলাম অশোকের লেখা, চিঠি বইটিতে যা রয়েছে, তার বাইরেও কিছু ব্যক্তিগত সংগ্রহে থেকে যেতে পারে। যদি কারো সংগ্রহে তেমন কিছু থাকে তা আমাদের কার্যালয়ের ঠিকানায় পাঠানোর আবেদনও করা হয়েছিল। প্রিয় পাঠকদের কাছে আমাদের বিনীত আবেদন অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা নিবন্ধ, ব্যক্তিগত ও সাংগঠনিক চিঠি থাকলে সরাসরি আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ (মোবাইল ৮৯০২৪১২২৯০/ ৯৮৩০৬৫৯০৫৮) অথবা নির্দিষ্ট পাতাগুলো স্ক্যান করে পত্রিকার ইমেইলে (e-mail) পাঠালে কৃতজ্ঞ থাকব। সংগ্রাহকের নাম পত্রিকায় প্রকাশ করা হবে। আপনাদের সহযোগিতা পেলে দ্বিতীয় সংস্করণ অচিরেই প্রকাশিত হবে এ নিশ্চিতভাবে বলা যায়।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০: উচ্চশিক্ষা জগতে সমস্যা

শ্যামশ্যাম কৃষ্ণপূজারি চট্টোপাধ্যায়

শিক্ষাজগৎ বর্তমানে এক মাহেন্দ্রক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে। সারা দেশ জুড়ে লাগু হচ্ছে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০। কর্নাটক, মধ্যপ্রদেশ, আসাম, উত্তরপ্রদেশ ইত্যাদি বেশ কয়েকটি রাজ্য ইতিমধ্যে এই শিক্ষানীতি আনুষ্ঠানিকভাবে মেনে নিয়েছে। ক্রমে ক্রমে চালু হবে অন্যান্য রাজ্যেও। বিষয়টা অনেকটা সারিবদ্ধ ডোমিনোর মতো। একটা হেলে পড়লে তার অভিঘাত এসে লাগে পরের ডোমিনোতে। এখানেও ক্রমশ একেকটি রাজ্য ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় বাধ্যত মেনে নিচ্ছে জাতীয় শিক্ষানীতি। না হলে যে রাজ্য এই শিক্ষানীতিকে সায় দেবে না, সেখানকার শিক্ষার্থীরা বাকি দেশের শিক্ষা-পরিকাঠামো থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

এই ডামাডোলের আবহে শিক্ষার আঙিনাতেও এসে লাগছে রাজনীতির রঙ। শিক্ষাবিদদের একাংশের মতে, জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। ১৯৮৬ সালের পর ৩৪ বছর জাতীয় স্তরে শিক্ষা-সংস্কার হয় নি। এই সংস্কার অনিবার্য ছিল। আবার অনেকে মনে করছেন, নতুন শিক্ষানীতি বেসরকারিকরণ এবং অসাম্য ডেকে আনবে; শিক্ষাকে বাজারি পণ্যে পরিণত করবে। এমতাবস্থায়, নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে এই শিক্ষানীতির যাথার্থ্য খতিয়ে দেখা দরকার। বিশেষত, পুঁজিবাদি শিক্ষা-ধর্ম-রাজনীতির যে ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হয়েছে, তার স্বরূপ উন্মোচন জরুরি। মুক্তচিন্তা এবং বিজ্ঞানচেতনা জাতীয় শিক্ষানীতিতে আদৌ কতটা গুরুত্ব পেয়েছে, সেটাই আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয়।

জাতীয় শিক্ষানীতিতে humanism, rationality, scientific consciousness, faith, superstition ইত্যাদি শব্দবন্ধের একবারও উল্লেখ নেই। অন্যদিকে, ইন্ডাস্ট্রি শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে সর্বমোট ১১ বার, ইকনমি ৬ বার, ট্র্যাডিশন ৩০ বার, এমপ্লয়মেন্ট ১১ বার। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রাইভেট শব্দটি এসেছে ৪২ বার। এর বিবিধ প্রয়োগের মধ্যে রয়েছে private schools, private universities, private HEIs, private organisations ইত্যাদি।

কোনো একটি শব্দের প্রয়োগ কোন্ পরিপ্রেক্ষিতে হচ্ছে, তা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। তবু পূর্বোক্ত পরিসংখ্যান থেকে সহজেই আঁচ পাওয়া যায়, জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০ মানবতাবাদ, বিজ্ঞানমনস্কতা, মুক্তচিন্তা ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ ভাবিত নয়। তার বদলে গুরুত্ব পাচ্ছে বাজারি অর্থনীতি। শিক্ষার উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে বেসরকারি কোম্পানিগুলির জন্য প্রশিক্ষিত কর্মী যোগান দেওয়া। এমতাবস্থায়, ইচ্ছাকৃতভাবে গুরুত্ব কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে মানবিকীবিদ্যার (humanities)। কারণ, মানবিকীবিদ্যা শিক্ষার ফলিত উপযোগিতার গণ্ডি পেরিয়ে প্রশ্ন করতে শেখায়। প্রচলিত কাঠামোর বিরুদ্ধে প্রতিস্পর্ধা শেখায়। একইভাবে, বিজ্ঞানমনস্কতা, সুস্থ সমাজচেতনা, মুক্তচিন্তা ইত্যাদি মৌল গুণাবলী জাতীয় শিক্ষানীতিতে উপেক্ষিত।

আপাতভাবে মনে হতে পারে, এইসব আশঙ্কার ভিত্তি কী? জাতীয় শিক্ষানীতি কি পুরোটাই খারাপ? নিশ্চয়ই নয়। শিক্ষার আধুনিকীকরণের বেশ কিছু সদর্থক প্রচেষ্টা এই শিক্ষানীতিতে রয়েছে। প্রাক্-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত সর্বজনীন শিক্ষার অধিকারকে গুরুত্ব দিয়েছে নয়া শিক্ষানীতি। বিদেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষাগত পর্যায়কে ৫+৩+৩+৪ বছরে পুনর্বিন্যস্ত করা হয়েছে। গ্রামীণ এবং প্রত্যন্ত প্রান্তে উচ্চমানের শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে স্বয়ম (SWAYAM), NPTEL, ePG-Pathshala ইত্যাদি ওয়েবসাইট এবং ডিজিটাল পোর্টাল চালু করা হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে জি ডিপি-র ৬ শতাংশ বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়েছে। এই সবই খাতায়-কলমে বেশ ভালো কথা। কিন্তু এই ধরনের সুভাষিতাবলির আড়ালে নতুন শিক্ষানীতিতে লুকিয়ে রয়েছে বেশ কিছু আশঙ্কার সম্ভাবনা।

ইতিমধ্যেই এইসব আশঙ্কা বাস্তবায়িত হতে শুরু করেছে। প্রথমেই খটকা লাগে জাতীয় শিক্ষানীতি চালু করার তাড়াহুড়ো দেখে। সমগ্র বিশ্ব যখন কোভিডের কবল থেকে সবেমাত্র ঘুরে দাঁড়াচ্ছে, ঠিক তখনই দেশের শিক্ষাব্যবস্থার খোলনলচে পালটে ফেলার এত তাড়া কীসের? এত বড়ো পরিবর্তন, যার সঙ্গে কোটি কোটি শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ জড়িত, তা নিয়ে সামাজিক পরিসর এবং সংসদীয় স্তরে আলোচনা করার জন্য যথেষ্ট সময় দেওয়া হয় নি। যে কোনো বিতর্ককে ধামাচাপা দিয়ে রাতারাতি শিক্ষানীতি পালটে ফেললে আখেরে শিক্ষার্থীদের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। অতিরিক্ত তাড়াহুড়ো করায় আরেক ধরনের সমস্যাও তৈরি হয়েছে। মেট্রো শহরগুলোর বাইরে অবস্থিত অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে জাতীয় শিক্ষানীতি চালু করার মতো পরিকাঠামো নেই। একটি

সহজ উদাহরণ দেওয়া যাক। স্নাতক স্তরের ডিগ্রি তিন বছরের পরিবর্তে চার বছরে সম্পন্ন হলে কলেজগুলির ওপর অতিরিক্ত এক বছরের শিক্ষার্থীদের চাপ বাড়বে। দরকার হবে বেশি শ্রেণিকক্ষ, বৃহত্তর লাইব্রেরি, অধিক শিক্ষক। বিশেষত, বিজ্ঞানের বিষয়গুলির ক্ষেত্রে গবেষণাগার ও যন্ত্রপাতিকেন্দ্রিক পরিকাঠামো আরও জরুরি। অথচ এই অভাব কীভাবে পূরণ করা হবে, জাতীয় শিক্ষানীতি সেই দিকে যথাযথ দিকনির্দেশ করে নি। জিডিপি-র ৬% শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যয়বরাদ্দ এখনও পর্যন্ত কেবল মৌখিক প্রতিশ্রুতি হয়ে রয়ে গেছে। বাস্তবে বরং কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বপোষিত (self-financed) কোর্সের সংখ্যা বেড়েছে। শিক্ষাকে মানবাধিকার বলে গণ্য করার বদলে বিপুল শিক্ষা ঋণ নিয়ে কর্পোরেটের দাস হওয়ার মার্কিন 'সংস্কৃতি' ক্রমশ ভারতেও প্রবেশ করছে। জাতীয় শিক্ষানীতি তার বিরোধিতা করা তো দূরের কথা, বরং বেসরকারি পুঁজির শিক্ষাক্ষেত্রে আগ্রাসনকে সোৎসাহে প্রশ্রয় দিয়েছে।

শিক্ষানীতিতে বারবার ইন্ডাস্ট্রি, স্কিল, প্রাইভেট ইত্যাদি শব্দের প্রাচুর্য এই বক্তব্যের প্রমাণ দেয়। কর্পোরেটের জন্য দক্ষ শ্রমিক তৈরি করা শিক্ষার উদ্দেশ্য নয়। বাস্তবমুখী বিদ্যার অবশ্যই প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বিশেষত, চিকিৎশাস্ত্র, প্রকৌশল, ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদি ক্ষেত্রে দক্ষতার বিকাশ অত্যন্ত জরুরি। এমন কি, এসবের বাইরে বিদ্যাচর্চার অন্যান্য শাখাগুলিতেও আধুনিক কালের উপযোগী কর্মমুখী জ্ঞানের সংক্রমণ ঘটানো দরকার। কিন্তু শিক্ষাকে কেবলই কর্মমূলক করে তুললে শিক্ষার মৌল ধারণাই বিকৃত হয়ে যায়। জ্ঞানের গভীরতা বৃদ্ধি এবং নতুন জ্ঞান উৎপাদনের মাধ্যমে মানব চরিত্রের বিকাশ শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। নতুন শিক্ষানীতি জ্ঞানচর্চার সেই পরম্পরা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্যুত হয়ে কেবল দক্ষ শ্রমিক তৈরিতে মনযোগ দিয়েছে।

জাতীয় শিক্ষানীতির আরেকটি বড়ো দুর্বলতা হল বিজ্ঞান এবং অপবিজ্ঞানের মধ্যে প্রভেদ গুলিয়ে দেওয়া। ভারতীয় জ্ঞান সংস্থান (Indian knowledge system) নামে যে ধারণাটি উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ক্রমশ চারিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তা একমাত্রিকভাবে একটি নির্দিষ্ট ধর্মের অহমিকার ওপর স্থাপিত। ভারতীয় সংস্কৃতিতে ধর্মীয় বৈচিত্র্যের গুরুত্ব সম্পর্কে IKS নীরব। এমনকি, ধর্মীয় গণ্ডির বাইরে নিরীশ্বরবাদী চার্বাক এবং লোকায়ত দর্শন সম্পর্কেও ভারতীয় জ্ঞান সংস্থানের বিশেষ আগ্রহ নেই। এটি বস্তুত ব্রাহ্মণ্যবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাস পুনর্লিখনের প্রয়াস মাত্র। এর পিছনে নিহিত রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ বর্তমান নিবন্ধের বিষয়বস্তু নয়। তবে এই অতীত অহমিকাই অতিরিক্ত বৃদ্ধি পেলে চন্দ্রযানের সঙ্গে পুষ্পক রথের তুলনা করা হয়, আধুনিক মনোচিকিৎসার বদলে সরকারি হাসপাতালের রোগীদের মানসিক শান্তির জন্য ভজন-কীর্তনের আসর বসে, বলিউড ছেয়ে যায় পুরাণের নবনির্মাণে, বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্যোতিষচর্চা, এইমসে হোমিওপ্যাথি 'নিউ-নর্মাল' হয়ে দাঁড়ায়।

একদিকে শিক্ষার আধুনিকীকরণের নামে ডিজিটাল আধিপত্য বিস্তার, অন্যদিকে অপবিজ্ঞানের প্রসারে প্ররোচনা দেওয়া—এই দুই প্রবণতা জাতীয় শিক্ষানীতির রাজনৈতিক চরিত্রকে স্পষ্ট করে তোলে। ভারতের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশে ডিজিটাল বৈষম্য একটি প্রতিষ্ঠিত সত্য। এমতাবস্থায়, কাগজ-কলমে পরীক্ষার বদলে এম সি কিউ ভিত্তিক অনলাইন পরীক্ষায় জোর দেওয়া হলে, স্বাভাবিকভাবেই শহুরে এবং স্বচ্ছল পরিবারের শিক্ষার্থীরা বেশি সুবিধা পাবেন। বৈষম্য ঘটবে গ্রামাঞ্চলের এবং দরিদ্র শিক্ষার্থীদের প্রতি। বিশেষত, প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থীরা (first generation learners), যারা ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহারে ততটা সড়গড় নন, অনলাইন ক্লাস/পরীক্ষা/মার্কশিট/অ্যাকাডেমিক ক্রেডিট ব্যাঙ্ক ইত্যাদির বিপুল সমারোহে তাদের অসুবিধার কথাটা কেউ আদৌ ভেবে দেখেছে কি? পিছিয়ে-পড়া শিক্ষার্থীদের অসুবিধা ছাড়াও ডিজিটাল-নির্ভর শিক্ষা আরেক ধরনের সমস্যার জন্ম দেয়। প্রত্যেক রাজ্যের অধিকার রয়েছে আঞ্চলিক চাহিদা অনুযায়ী নিজের নিজের শিক্ষা পরিকাঠামো, পাঠক্রম ইত্যাদি গড়ে তোলার। কিন্তু জাতীয় শিক্ষানীতি যাবতীয় আঞ্চলিক বৈচিত্র্যকে দুরমুশ করে শিক্ষাক্ষেত্রে একাধিপত্য স্থাপন করতে চায়। একটি উদাহরণ দিয়ে এই আধিপত্যের বিষয়টি দেখে নেওয়া যাক। ২০২১ সাল থেকে ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সির (NTA) তত্ত্বাবধানে আয়োজিত হচ্ছে সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশিকা পরীক্ষা (CUET)। প্রাথমিকভাবে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরে এই পরীক্ষা প্রযোজ্য হলেও ক্রমশ রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও এই পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের যোগ্যতামান যাচাইয়ের সায় দিচ্ছে। এর ফলে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠাগুলির নিজস্ব স্বর ক্রমশ লোপ পাচ্ছে। নিয়ন্ত্রণ চলে যাচ্ছে দিল্লির হাতে।

প্রত্যেকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের---বিশেষত, বিশ্ববিদ্যালয়ের—নিজস্ব চরিত্র থাকে। ধরা যাক, কোনো শিক্ষার্থী ইংরেজি ভাষায় স্নাতকোত্তর স্তরের ডিগ্রি কোর্সে ভর্তি হতে চাইছেন। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে তাঁর যা প্রত্যাশা

থাকে, বিশ্বভারতীর কাছে নিশ্চয়ই তার থেকে ভিন্ন কিছু প্রত্যাশা থাকে। দুটিই খ্যাতনামা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়। কিন্তু এদের সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক চরিত্র ভিন্ন। জাতীয় শিক্ষানীতি এই মৌল বৈচিত্র্যকে সম্মান করে না।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিজের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী শিক্ষার্থী বেছে নেওয়ার ক্ষমতাকে সম্মান করে না। পরিবর্তে সব এক ছাঁচে ঢালাই করলে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খাঁচায় বন্দি তোতাপাখি হয়ে দাঁড়ায়!

জাতীয় শিক্ষানীতি সম্পর্কিত রাজনৈতিক তরজায় আরেকটি নিবিড় সমস্যার কথা প্রায়শই ধামাচাপা পড়ে যাচ্ছে। সেটি হল শিক্ষার গভীরতা হ্রাসকে প্রণোদিত করে এই নয়া শিক্ষানীতি। একটি পাঠক্রমে একাধিকবার প্রবেশ এবং বাহির হওয়ার (multiple entry and exit) সুযোগ করে দিলে বিদ্যাচর্চার ধারাবাহিকতা নষ্ট হয়। একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়া শুরু করে মধ্যপথে ক্রেডিট ট্রান্সফারের সুযোগে অন্য প্রতিষ্ঠানে গিয়ে পড়া শেষ করা মানে জাতীয় শিক্ষানীতি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে নিছক ডিগ্রি প্রদানকারী সংস্থা হিসাবে বিবেচনা করছে। সহজেই প্রতিস্থাপনযোগ্য, ঠিক কর্পোরেট চাকরিজীবীদের মতো। এই মানসিকতা দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি কতটা অসম্মানজনক, তা বোধহয় ব্যাখ্যা না করলেও চলে।

সমস্যা রয়েছে আরও বহুরকম। ভাষিক আধিপত্যের সমস্যা, গবেষণায় শেকল পরানোর সমস্যা ইত্যাদি। বর্তমানে সংক্ষিপ্ত আকারে মূল সমস্যাগুলির কথা উল্লেখ করা হল মাত্র। রাজনৈতিক পথে কোনো কোনো রাজ্য এইসব সমস্যার সমাধান খোঁজারও চেষ্টা করছে। বিদ্যায়তনিক ক্ষেত্রেও সকলের এই বিষয়ে সচেতন হওয়ার সময় এসেছে।

তথ্যঋণ : ১। "National Education Policy 2020." Ministry of Education, Government of India,29 July 2020,https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English.pdf

২। "Decoding the Agenda." Frontline, vol. 40, no. 22, 2023, pp. 20-27. The Hindu, https://frontline.thehindu.com/cover-story/decoding-the- agenda/article32306146.ece

উ মা

জানুয়ারি-মার্চ ২০২৪ সংখ্যায় *ঋতুকথন* প্রবন্ধটি সম্বন্ধে পাঠকের মতামত

ঋতুকথন লেখাটি পড়ে আমার মনে হয়েছে, লেখাটি আজও ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক। কারণ শুধুমাত্র মাসিক হওয়ার কারণে নানারকমের বিধিনিষেধের পাহাড় আমাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। বড়দের কথা ওই বয়সে আমরা মুখ বুজে মেনে নিই। প্রথম যখন আমরা ঋতুমতী হই তখন বয়সটা থাকে ১১ কি ১২ বছর। ওই বয়সে শরীরের ওই পরিবর্তনে আমরা মেয়েরা খুব ভয় পেয়ে যাই। ফলে বড়রা যে কাজগুলো করতে বারণ করেন, আমরা মুখ বুজে তা মেনে নিই। সেই অবুঝ বয়স থেকে মানতে মানতে আমরা বিষয়গুলিতে অভ্যস্ত হয়ে যাই। মনের মধ্যে সে কথাগুলো গেঁথে যায়। তাই আমার মনে হয়, মেয়েদের শরীর বিষয়ক এই ধরনের লেখা আরো বেশি বেশি করে ছাপা হওয়া দরকার।

সুদীপা গায়েন (বি এ ফাইনাল ইয়ার)
বালি সত্যনারায়ণ তলা

ঋতুকথন লেখাটি পড়ে মনে হল এই লেখা আরও আগে লেখা হলে ভাল হত। লেখাটা পড়ে মনে হয়েছে, আমরা কোন দেশে বাস করছি! আজও ঋতুস্রাব বা মাসিক নিয়ে আমাদের অযৌক্তিক বিধিনিষেধ মেনে চলতে হয়। যেমন, ঠাকুরঘরে যাওয়া যাবে না, ঠাকুরের বাসন ছোঁয়া যাবে না, আচার ধরা যাবে না, পাঁচ দিন হয়ে গেলে মাথায় সাবান দিয়ে স্নান করতে হবে; কারণ মাসিক হলে নাকি মেয়েরা অশুদ্ধ হয়ে যায়। বিয়ে, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, এমনকি শ্রাদ্ধবাড়িতেও যাওয়া যাবে না। গেলেও দূরে দূরে থাকতে হবে, বড়দের সাহায্য করা যাবে না। বড়দের জিজ্ঞাসা করলে উত্তর একটাই, এই সময়ে মেয়েরা অশুদ্ধ থাকে।

আমি গ্রামের মেয়ে, বালিতে থাকি। শহুরে ছোঁয়ায় এই সব নিয়মের অনেক কিছুই মানি না। তবে মাসিকের সময় ঠাকুরঘরে যাই না, বা ঠাকুরঘরের জিনিসপত্র ছুঁই না, সেটা মনে হয় অভ্যাসগত কারণে। যাই হোক, এই ধরনের লেখা আরও বেরোলে এই কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করতে পারব। আমাদের মনের অন্ধকার অনেকটা কেটে যাবে।

স্বপ্না বাগদি (বি এ ফাইনাল ইয়ার)
হুদুতপাড়া, বালি। উ মা

নগরকৃষি ঃ শহরের স্থিতিশীল উন্নয়নের একটি বিশেষ হাতিয়ার

শ্রবণা মজুমদার

বর্তমান বিশ্বের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সিংহভাগই শহরাঞ্চলকে ঘিরে। আধুনিক শহরগুলিতে বিশ্বের জনসংখ্যার ৫৪% বেশি লোক বাস করে। আশা করা যায় এই সংখ্যা ২০৩০ সালের মধ্যে প্রায় ৫৯% বৃদ্ধি পাবে। এই বৃদ্ধির হার পরের চার দশকে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে এরকমটাই জাতিসংঘের রিপোর্ট অনুযায়ী মনে করা হচ্ছে (ইউনাইটেড নেশনস, ২০১৮)। এই একমুখী নগরায়নের বহু নেতিবাচক দিক আমরা এর মধ্যে দেখতে পাচ্ছি। এই শহরগুলির বেশিরভাগই পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির ওপর নির্ভরশীল নয়, তাই সারা বিশ্বের প্রায় ৭৫% শক্তি এই শহরগুলিতে ব্যবহার হয়ে থাকে। এছাড়াও অনুমান করা হয় ৮০% কার্বনডাইঅক্সাইড নির্গমনের জন্য এবং প্রচুর পরিমাণে বর্জ্যপদার্থ তৈরির জন্যও এই শহরগুলি দায়ী (ইউনাইটেড নেশনস, ২০১৮)। এই শহরগুলি প্রচুর পরিমাণে জল ব্যবহার করে, যা বেশিরভাগ সময়ই ভূমধ্যস্থ জল থেকে আসে। এসব পরিবেশগত সমস্যা ছাড়াও বিভিন্ন আর্থসামাজিক সমস্যা যেমন দারিদ্র, বেকারত্ব, বাসযোগ্য স্থানের অভাব এবং এই মৌলিক পরিকাঠামোর সাথে সম্পর্কিত নানা সমস্যা। এই সমস্যাগুলি আরো বেশি প্রকট শহরের দরিদ্র শ্রেণীর মানুষদের জীবনে। বিভিন্ন গবেষণায় অনুমান করা হচ্ছে যে জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সাথে শহরের এই সমস্যাগুলি আরো তীব্র হবে যা শহরের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও পরিকাঠামোর ওপর উত্তরোত্তর চাপ সৃষ্টি করবে। যা ভবিষ্যতে জাতিসংঘের স্থিতিশীল উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রাগুলি অর্জন করতে বাধা সৃষ্টি করবে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যাকে সঙ্গী করে শহরের স্থিতিশীল উন্নয়নের জন্য শহরের পরিবেশের বর্ধিত নমনীয়তা প্রয়োজন, যা সম্ভব হতে পারে প্রাকৃতিক সম্পদের আরো উপযুক্ত ব্যবহার এবং পুনর্ব্যহার আর তার পাশাপাশি শহরের পরিকাঠামো ব্যবস্থার সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে। এইসব সমস্যাগুলোই সামগ্রিকভাবে সমাধান করা সম্ভব নগরকৃষির (urban agriculture) মাধ্যমে। নগরকৃষি হল শহরের মধ্যে বা প্রান্তে অবস্থিত কৃষি এলাকা, যা শহর এলাকায় এবং এর আশেপাশে পাওয়া সম্পদ, পণ্য এবং পরিষেবাগুলি ব্যবহার করে এবং ফলস্বরূপ, সেই এলাকায় খাদ্য, পণ্য এবং পরিষেবা সরবরাহ করে (Zezza and Tasciotti, 2010)। এই কৃষিব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে উদ্যানপালন, ফুল-ফল-শস্য চাষ, বনায়ন, জলজচাষ এবং পশুসম্পদ উৎপাদন। নগর কৃষিব্যবস্থায় কৃষকরা, শহরের জমি, জনসেবা, এমনকি শহুরে বর্জ্যপদার্থও উৎপাদনে ব্যবহার করে। তারপরে তারা স্থানীয় বাজারে উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রি করে এবং প্রায়শই সেই লাভ উৎপাদনের জন্য পুনর্বিনিয়োগ করে। এই উৎপাদন এবং পুনর্বিনিয়োগের বৃত্তাকার ধারণাটি স্থিতিশীল শহরের ধারণার সাথে পুরোপুরি মিলে যায়। এই বিশেষ বৈশিষ্ট্য গ্রামীণ কৃষি থেকে নগরকৃষিকে পৃথক করে। তাই UN-HABITAT রিপোর্টেও শহরগুলির সর্বাঙ্গীণ বৃদ্ধির জন্য নগরকৃষিকে একটি উদ্ভাবনী সমাধান হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে (De Zeeuw ey al. 2011)।

শহর এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থায় কৃষি উৎপাদনের জন্য জমিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় না। তাই কৃষি জমিগুলি প্রতিস্থাপিত হয় অন্যান্য ভূমির ব্যবহার দ্বারা (যেমন আবাসন, পরিবহণ এলাকা, অবকাশ এলাকা ইত্যাদি), যেগুলি প্রাথমিকভাবে উচ্চবাজার মূল্য প্রদান করে (Lovell, 2010)। তাই শহরগুলির সম্প্রসারণের সময় তার আশপাশের বেশিরভাগ কৃষিজমিকে গ্রাস করে নিচ্ছে। ফলস্বরূপ, উৎপাদন এলাকা এবং বাজারের মধ্যে দূরত্ব ক্রমশ বাড়ছে, যা দিনে দিনে খাদ্যপণ্যের দাম বাড়িয়ে তুলছে। এই খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করে শহরের দরিদ্র মানুষদের। নগরকৃষি এই দরিদ্র মানুষগুলির পুষ্টিকর খাদ্যের যোগানকে সুরক্ষিত করতে পারে। হারারে, কাম্পালা এবং নাইরোবির মতো বিভিন্ন আফ্রিকার শহরে গবেষণা করে দেখা গেছে, যে দরিদ্র পরিবারের সদস্যরা নগরকৃষির সাথে যুক্ত তাদের খাদ্যের যোগান আর খাবারের গুণমান যেমন ক্যালোরি এবং প্রোটিন গ্রহণ, বা শিশুদের বৃদ্ধির হার তুলনামূলকভাবে ভালো (De Zeeuw et al. 2011)। বর্তমান শহরগুলি খাদ্যদ্রব্যের জন্য গ্রামীণ কৃষির উপর প্রচুর পরিমাণে নির্ভর করে থাকে। নগরকৃষি এই গ্রামীণ সরবরাহের পরিপূরক হতে পারে। নগরকৃষিতে উৎপাদন এলাকাগুলি শহরের বা বাজারের কাছে অবস্থান করে বলে তা ফলমূল, শাকসবজি, দুগ্ধজাত দ্রব্যের একটা গুরুত্বপূর্ণ উৎস হতে পারে। একটি গবেষণা অনুসারে বর্তমানে নগরকৃষি শহরাঞ্চলের সমস্ত

খাদ্যের আনুমানিক ১৫% সরবরাহ করে (De Zeeuw et al. 2011)। কিছু প্রকাশনায় এটাও বলা হয়েছে যে এশিয়ার কিছু শহর, নগরকৃষির ইতিবাচক প্রভাবে পুষ্টিকর ও পচনশীল খাদ্যের সাপেক্ষে অনেকটাই স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠেছে এবং কিছু শহর এই নগরকৃষির উদ্বৃত্ত উৎপাদন বিদেশেও রপ্তানি করে থাকে। সাংহাই শহরে সরবরাহ করা সবজির ৭৬% শহরের ১০ কিলোমিটারের মধ্যে উৎপাদিত হয় এবং বেইজিং-এর ৭৯% ফলের সরবরাহ শহর সংলগ্ন এলাকা থেকে আসে (Lee-Smith and Prain, 2006)। গবেষণা ইঙ্গিত করে যে নগরকৃষির উদ্ভাবনী পদ্ধতিগুলি যেমন সম্প্রদায় বাগান, ছাদের বাগান, উল্লম্ব খামার এবং হাইড্রোপনিক্স ইত্যাদি শহরের ১০% এরও কম জমি ব্যবহার করে ব্যক্তির প্রতি প্রস্তাবিত দৈনিক ব্যবহারের জন্য পর্যাপ্ত সবজি উৎপাদন করতে পারে। দক্ষিণ আমেরিকার হাভানাতে নগর কৃষি স্থানীয় জনগণকে দৈনিক মাথাপিছু ১৫০ থেকে ৩০০ গ্রাম তাজা শাকসবজি এবং ভেষজ সরবরাহ করে। সম্প্রতি কোভিড-১৯ অতিমারীর সময় আমরা বিশ্বব্যাপী খাদ্য সরবরাহের সংকট প্রত্যক্ষ করেছিলাম। উন্নত এবং উন্নয়নশীল বিভিন্ন শহরে দেখেছিলাম ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে মানুষ লাইন দিয়েছে খাদ্যসামগ্রী কেনার জন্য। অনেক সময় দেখেছিলাম সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে আমেরিকা, ব্রিটেনের মতো উন্নত দেশেও খাদ্যসামগ্রী মজুত নেই। দীর্ঘমেয়াদী লকডাউন পরিস্থিতিতে গ্রাম থেকে শহরে খাদ্যসরবরাহ শৃঙ্খল ভীষণভাবে ব্যাহত হয়েছিল, যার ফলে শহরের খাদ্য সরবরাহ গুরুতরভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। কোভিড-১৯ অতিমারীর পর্ব নতুন করে আমাদের নজরে এনেছে যে দীর্ঘমেয়াদে শহরগুলির খাদ্য নিরাপত্তায় কিছুমাত্রায় হলেও স্বনির্ভরতার প্রয়োজন। এমনকি কোভিড পরবর্তী সময়েও ভারতের মতো দেশে যেখানে বেকারত্বের সমস্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে, অনেক লোকেরই ক্রয় ক্ষমতা কমে যাচ্ছে এবং খাদ্যপণ্যের বাজারও আগুন সেখানেও স্থানীয় কৃষি উৎপাদনকে একটি অনুপূরক কৌশল হিসেবে দেখা যেতে পারে।

শহরের খাদ্য সরবরাহকে কার্যকর করার পাশাপাশি দরিদ্রদের আয় বৃদ্ধির এক উপায় হতে পারে নগরকৃষি। আফ্রিকার বিভিন্ন শহরে গবেষণার মাধ্যমে দেখা গেছে যে নগরকৃষি থেকে উৎপন্ন ফল এবং শাকসবজির মতো উচ্চমূল্যের খাদ্যদ্রব্য স্থানীয় বাজারে বিক্রি করে বিভিন্ন মানুষ বিকল্প আয় সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশের একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে ছাদে পশু ও পাখি পালন স্থানীয় অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল (Rahman et al. 2015)। উপরন্তু, নগরকৃষি প্রয়োজনীয় কৃষি উপকরণ (যেমন, পশুখাদ্য, কম্পোস্ট, কেঁচো) উৎপাদন, পণ্যের প্রক্রিয়াকরণ, প্যাকেজিং এবং বিপণনের মধ্যে দিয়ে ক্ষুদ্র উদ্যোগের বিকাশকেও উন্নত করতে পারে যা স্থানীয় অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে পারে (Zezza and Tasciotti, 2010)। সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে নগরকৃষি শহরের প্রধানত দরিদ্র এবং প্রান্তিক মানুষদের (যেমন, এইচ আই ভি আক্রান্ত পরিবার, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, মহিলা প্রধান পরিবার, পেনশন ছাড়া বয়স্ক মানুষ, বেকার যুবক) সামাজিক অন্তর্ভুক্তি এবং ক্ষমতায়নেও একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হিসাবে কাজ করতে পারে (Lovell,2010)। কৃষিকাজের মাধ্যমে এই প্রান্তিক মানুষগুলোকে জীবিকা প্রদান করে নগরায়ন দ্বারা বর্ধিত সামাজিক বৈষম্য কমানো যেতে পারে। এছাড়াও শহুরে নাগরিকদের বিনোদনমূলক এবং শিক্ষামূলক কার্যক্রম প্রদানের মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে নগরকৃষি (Liu ey al. 2003)। অনেক সমীক্ষা ইঙ্গিত করে যে, নারীরা নগরকৃষিতে যুক্ত থাকায় তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে যা তাদের পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে আরো স্বাবলম্বী করে তুলেছে। ফলস্বরূপ তাদের পরিবারের পুষ্টি এবং খাদ্যাভ্যাস উন্নততর হয়েছে। Lovell (2010) এর একটি উল্লেখযোগ্য সমীক্ষা প্রমাণ করছে যে নগরকৃষি সমাজে আন্তঃজাতিগত সম্পর্ক উন্নত করে এবং অপরাধের হার হ্রাস করে। জাম্বিয়ার কপারবেল্ট অঞ্চলে চরম অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংকট থেকে বেরিয়ে আসার জন্যও নগরকৃষি একটি উল্লেখযোগ্য কৌশল হিসেবে কাজ করেছিল (Smart et al., 2015)। Liu ey al. (2003) তাদের গবেষণায় দেখিয়েছেন যে বেইজিং এবং সিডনিতে বিপুলসংখ্যক অধিবাসী নগরকৃষিতে জড়িত ছিল যা তাদের নতুন দেশে স্থিতিশীলতার অনুভূতি তৈরি করতে সাহায্য করেছিল। উন্নত দেশের গবেষণার মাধ্যমে এটাও দেখানো হয়েছে যে নগরকৃষি থেকে অর্জিত জ্ঞান এবং সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ স্থানীয় মানুষদের মধ্যে একটি সামাজিক সেতু হিসেবে কাজ করে, যা খাদ্যের সাথে সম্পর্কিত ঐতিহ্য বজায় রাখতে সাহায্য করে।

নগরকৃষি শহরে গাছপালার আচ্ছাদন বৃদ্ধি করে পরিবেশগত সমস্যাগুলিও উপশম করতে সাহায্য করে এবং শহরগুলিকে আরও বাসযোগ্য করে তোলে। Merson et al. (2010) তাদের গবেষণায় পর্যবেক্ষণ করেছেন যে গ্রীষ্মের

মাঝামাঝি দিনে অস্ট্রেলিয়ার একটি শহরের আবাসিক এলাকার তুলানয় কৃষিজমিগুলি যথেষ্ট ঠাণ্ডা থাকে। এর থেকে বোঝা যায় এই কৃষি এলাকাগুলি শহরের স্থানীয় জলবায়ুর (Micro climate) উপরেও ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। এটা অনুমান করা হয় যে নগরকৃষি এলাকাগুলি গ্রিনহাউস গ্যাসের আধার হিসাবে কাজ করার ক্ষমতা রাখে যা বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ন্ত্রণে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারে (Marques-Perez and del Rio, 2016)। বর্তমানে অনেক সময় দেখা যায় বিভিন্ন শহরই অধিক বৃষ্টি হলে প্লাবিত হয়ে যায় এবং সেই জল নামতেও বেশ কিছুদিন অপেক্ষা করতে হয়। বন্যার অতিরিক্ত জলকে ধারণ করে শহর সংলগ্ন কৃষিক্ষেত্রগুলি আমাদের এই শহুরে প্লাবনের (Urban flood) হাত থেকেও বাঁচাতে পারে। এছাড়াও, শহরের বর্জ্য পুনর্ব্যবহার করে শহুরে পরিবেশের উন্নতিতে নগরকৃষি বিশেষভাবে সাহায্য করে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এটা পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে, নগরকৃষিকে শহরের পরিকাঠামোগত পরিকল্পনার আওতায় আনলে কিভাবে শহরগুলি প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বেড়ে উঠতে পারবে এবং তার সাথে সমাধান হবে অনেক আর্থসামাজিক সমস্যারও। অবশেষে বলা যায় নগরকৃষি হল বহুমুখী, তাই শহরের মানুষ এবং পরিবেশের জন্য এটি একাধিক সুবিধা প্রদান করে। এই বহুমুখী সম্ভাবনার জন্য, ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশে এই কৃষিজমিগুলোকে যদি সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে সংরক্ষণ করা যায় তাহলে তা জলবায়ুর উপর মানুষের প্রভাবকে যেমন হ্রাস করতে পারে তার সাথে শহরের খাদ্য সরবরাহের মধ্যেও কিছুটা স্থিতিস্থাপকতা নিয়ে আসতে পারে, যা ভবিষ্যতে জাতিসংঘের স্থিতিশীল উন্নয়নের লক্ষ্যপূরণে একটা উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারে।

উমা

সিকিম হিমালয়ে হিমবাহের গলন

শান্তনু গুপ্ত

প্রায় এক দশক আগে ২০১০-এর ৬ আগস্ট মাঝরাতে লেহ-তে প্রচণ্ড মেঘ-ভাঙা (cloud burst) বৃষ্টি হয়েছিল। দু'ঘণ্টায় ১৪ ইঞ্চি বৃষ্টি। মনে আছে সেই সময়েরই কিছু পরে ২০১৬ সালে তিস্তা নদীর ওপরে পশ্চিমবঙ্গের কালিঝোরার কাছে একটা বড় বাঁধ দেওয়া হয় যা নিয়ে অনেক দুর্নীতি আর প্রচণ্ড বিতর্ক হয়েছিল। স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা থেকে ভূতাত্ত্বিক সকলেই এই বাঁধ তৈরি হবার পর থেকে যেভাবে সিকিম হিমালয়ের নীচের অংশে ভূমিধ্বস শুরু হয়েছিল তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। তখন আমার সিকিমে কর্মসূত্রে প্রায় এক দশকের বেশি থাকা হয়ে গেছে। পরিবেশ বিজ্ঞান নিয়ে আমার পড়াশোনা। সেইজন্য এসব ঘটনা আমার নজরে আসে। যখনই ওই নদী বাঁধের পাশ দিয়ে যেতাম মনে হত কি অবিবেচকের মতো পাহাড়ের কৌণিক ঢালকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে সোজাসুজি পাহাড় কেটে দেওয়া হয়েছে। তার ফলে কিছু কিছু জায়গায় তিস্তা কি বিপজ্জনকভাবে জাতীয় সড়কের একদম কাছে চলে এসেছে। পাহাড়ি নদী এমনিতেই দামাল। ১৯৬৮-তে তিস্তার জলপাইগুড়ি শহর ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা শুনেছি। মনে হত, লেহ লাদাকের মতো মেঘ-ভাঙা বৃষ্টি আর হরপা বাণ হলে এর পর কি হবে? মনে মনে যুক্তি খাড়া করতাম যে, উত্তর পশ্চিম হিমালয়ে যেমন ঘন ঘন মেঘ-ভাঙা বৃষ্টি হয় সিকিম হিমালয়ে তেমন হয় না। তবে মনের আশঙ্কা ছিল। তা সত্যি হল ২০২৩-এর ৪ অক্টোবরের মধ্যরাতে। তিস্তায় হড়পা বাণ এসে সিকিম-পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী রংপো আর সিংতামের ফ্লাড প্লেনে বাস করা মানুষ আর ঘর-বাড়ি-গাড়ি সব ভাসিয়ে নিয়ে গেল। যদিও এটা লাদাখের মতো মেঘ-ফাটা বৃষ্টি আর বন্যা নয়। এটা গ্লেসিয়াল লেক উপচে বন্যা।

শেষ ১৫ বছরে সিকিমে তিস্তার উচ্চ থেকে নিম্ন অববাহিকায় প্রায় ছ'টি বাঁধ দেওয়া হয়েছে। এমনিতেই সিকিম হিমালয় ভূতাত্ত্বিকভাবে ভঙ্গুর আর ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকা। তার ওপর উত্তর সিকিমের সুউচ্চ অববাহিকায় এতগুলো বাঁধ পুরো জায়গাটাকে বিপজ্জনক করে তুলেছে। এর সাথে জুড়তে হবে শেষ তিরিশ-চল্লিশ বছরের প্রচণ্ড গ্লেসিয়াল মেল্টিং। উত্তর সিকিমের সুউচ্চ অংশে প্রায় ১৩ থেকে ১৪টি হিমবাহ বা গ্লেসিয়ার আছে যার বরফ গলা জলে তিস্তা, তিস্তার শাখানদী রঙ্গিত, আর অন্য নদীগুলো পুষ্ট হয়। তিস্তা নদীর উৎসস্থল হল পূর্ব রাথং গ্লেসিয়ার। রাথং হিমবাহের বরফ ঘনত্ব ২০০৪ সালে ছিল ৯১.৫ মেট্রিক টন। ২০২১ সালে সেটা কমে দাঁড়িয়েছে ৭৬.৪ মেট্রিক টন (Sharma & Gupta 2023)। শেষ ১৭-১৮ বছরে রাথং হিমবাহের এই বিপুল গলন হিমবাহের ঠিক নীচে তৈরি হওয়া লোনাক লেকের আয়তন বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। ১৯৯০ সালে লোনাক লেকের আয়তন ছিল ৯০০ বর্গ মিটার।

শেষ তিরিশ বছরের উষ্ণায়নের ফলে গ্লেসিয়ার গলে ২০২১ সালে সেই লোনাক লেকের আয়তন বেড়ে হয়েছে ৫১৩০০ বর্গ মিটার। দেখা গেছে, ১৯৯০ থেকে ২০২১ এই ৩০ বছরে (যাকে ক্লাইমেটিক নর্মাল ধরা হয়) রাথং হিমবাহের একদম পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের গড় তাপমাত্রা ১.৭৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ৩.১৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বেড়েছে। লাগাতার উষ্ণায়নে আয়তনে বেড়ে লোনাক লেকের এক প্রান্তে অনেকদিন ধরেই একটা শুঁড়ের মতো বর্ধিত অংশ তৈরি হয়েছিল। লোনাক লেকের চারপাশের ন্যাড়া ঢালগুলো বেড়ে যাওয়া জলের চাপে এমনিতেই ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিল। শুধু দরকার ছিল একটা ট্রিগারিং পয়েন্ট। ৩ অক্টোবর রাত থেকেই অকাল বৃষ্টি সেই ট্রিগারিং পয়েন্ট তৈরি করে দেয়। লেকের আলগা ন্যাড়া ঢালগুলো ধসে পড়ে ডেব্রিস নীচে নেমে আসে। সম্ভবত সেই চাপেই গ্লেসিয়াল লেকের শুঁড়ের মতো বর্ধিত অংশ থেকে জল একসাথে উপচে পড়ে মুহূর্তের মধ্যে নীচের দিকে ভয়াবহ বন্যার সৃষ্টি করে। এ প্রসঙ্গে বলে রাখা ভাল যে সিকিম সরকার এই বন্যা হবার কিছু আগেই লাদাখের বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নিয়ে এই লোনাক লেকে আর্লি ওয়ার্নিং সিস্টেম বসিয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল যখন লেকের জল উপচে পড়ার উপক্রম করবে তখন যেন এই ওয়ার্নিং লক্ষ্য করে প্রশাসন আর জনগণকে আগাম সতর্ক করে দেওয়া যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এই সিস্টেম সেদিন কাজ করে নি। আবারও মনে করিয়ে দিই যে এটা ক্লাউড বার্স্ট নয়, গ্লেসিয়ার লেক আউটবার্স্ট ফ্লাড। এই এক রাতের হড়পা বাণে ১৪টা ব্রিজ ভেঙেছে, জাতীয় সড়কের কিছু জায়গা এখনও ক্ষতিগ্রস্ত, আর উত্তর সিকিমের লাচেনের সঙ্গে সড়ক যোগাযোগ এখনও পুরোপুরি স্বাভাবিক করা যায় নি। এই বন্যায় ১২০০ মেগাওয়াটের তিস্তা স্টেজ তিন ড্যাম পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেছে।

উত্তর সিকিমে এইরকম আরও অনেক নতুন তৈরি হওয়া গ্লেসিয়াল লেক রয়েছে যা শেষ কয়েক দশকে আয়তনে অস্বাভাবিক বেড়ে যাওয়ায় যে কোনো সময় যদি অস্বাভাবিক বৃষ্টি বা লেকের চারপাশে ভূমিধ্বস হয়, তাহলে তিস্তায় বা সিকিমের অন্য কোনো নদীতে হড়পা বাণ ডেকে আনতে পারে। তিস্তার নিম্নধারায় রংপো সিংতামে সবচেয়ে ঘন বসতি রয়েছে। অন্য রাজ্য থেকেও অনেক মানুষ এখানে এসে বসবাস করছেন। বাইরের শ্রমিক আর কিছু স্থানীয় মানুষ একেবারে তিস্তার প্লাবন ভূমির ওপর বাস করছেন। রংপো আর সিংতামে অবস্থিত তিস্তার প্লাবন ভূমি চার-পাঁচ তলা বাড়িতে আর অফিসে ঢেকে গেছে। তিস্তার নিম্নধারায় অবস্থিত এইসব ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় বন্যার অতিরিক্ত জল যাওয়ার মতো আর কোনো জায়গা নেই। প্রশাসন সতর্ক না হলে ভবিষ্যতের হড়পা বাণে এর থেকে অরও অনেক বড় বিপদ আসতে পারে। পূর্ব সিকিমে কংক্রিটের জঙ্গল দিয়ে তিস্তার প্লাবন ভূমি ঢেকে দিলে হড়পা বাণের সময় প্রাণে বাঁচা অসম্ভব হয়ে যাবে। প্রশাসকদেরও বুঝতে হবে দেশের অন্য জায়গার মডেলের অনুকরণ করে তিস্তার উচ্চ ধারায় একের পর এক বাঁধ দিলে তা এই সুন্দর পাহাড়ি রাজ্যের পক্ষে আত্মহত্যার সামিল হবে।

উষ্ণায়ন এক অদ্ভুত চক্র। উষ্ণায়নের জন্য পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশের একটা বড় অংশের চাষের জমি তার চাষ যোগ্যতা হারাচ্ছে (Climate-induced displacement & migration in India, Climate Action Network South Asia Report, Feb. 2011)। কৃষিজীবী মানুষ কর্মহীন হচ্ছেন। বাধ্য হয়ে কাজের আশায় এঁরা যাচ্ছে দিল্লি, ব্যাঙ্গালোর। কেউ কেউ আবার সিকিমের পাহাড়ে শ্রমিক হয়ে তিস্তার অববাহিকায় রংপো সিংতামে এসে উঠছেন। অন্য দিকে সিকিমের উঁচু পাহাড়ে উষ্ণায়নের জন্য হিমবাহ গলছে। হিমবাহের নীচে বরফ গলে লেক তৈরি হচ্ছে। সেই লেক একদিন উপচে পড়ে ভাসিয়ে দিচ্ছে রংপো সিংতাম এলাকা। সেই ফ্লাড প্লেনে কারা বেশি সংখ্যায় বসতি করে রয়েছেন? পাহাড়ি মানুষেরা নন। সেখানে বাস করছেন উষ্ণায়নের ফলে রাজ্য ছাড়া হওয়া পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন, মধ্যপ্রদেশের বুন্দেলখন্দ, বিহার, উড়িষ্যা আর উত্তরপ্রদেশের গরিব মানুষ। এইভাবে উষ্ণায়ন আর জলবায়ু পরিবর্তন এইসব মানুষদের জীবনভর তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। কারও কারও জীবন কেড়ে নিচ্ছে। বিপর্যয়ের পর এরা সরকারি সাহায্যও পাচ্ছেন না। কারণ এরা পরিযায়ী শ্রমিক। যার দেশ নেই, পাকা বাসা বা ঠিকানা নেই। যেমন আমাদের কলেজের পিছনে তিস্তার পাড়ে যে বিহারি ছেলেটি জামাকাপড় ইস্ত্রির কাজ করে। সেদিনের বন্যায় ওর সব ভেসে গেছে। ছেলেটি সময়মতো উঁচু জায়গায় দৌড়ে পালিয়ে বেঁচেছে। হড়পা বাণের পর প্রায় চাঁদা করেই ছেলেটি তার কাজের সরঞ্জাম আবার কিনতে পেরেছে।

উমা

গ্রন্থ পরিচিতি

বিজ্ঞান, না-বিজ্ঞান, অপবিজ্ঞান—একটি চিরকালীন দ্বন্দ্ব

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে বিজ্ঞান ... না-বিজ্ঞান ১৭০০-২০০০
আশীষ লাহিড়ী
প্রকাশক - সাহিত্য সংসদ। দাম - ৩০০.০০

অপবিজ্ঞান, ইংরাজিতে প্যারানরমাল সায়েন্স, প্যারা সায়েন্স, সিউডো সায়েন্স ইত্যাদি। সিউডো বা প্যারা বা পরা—এর অর্থ ভ্রান্ত (false), তাই তা ক্ষতিকর, যে কারণে এর অপর নাম অপবিজ্ঞান। গ্রন্থকার এখানেই প্রথম পরিবর্তনের সুপারিশটি করলেন। রচিত পুস্তকের নাম-পত্রেই ঘোষিত হয়েছে শব্দটি 'না-বিজ্ঞান'। অর্থাৎ, প্যারানরমাল সায়েন্স, সিউডো সায়েন্স ইত্যাদি থেকে সটান বাদ যাবে সায়েন্স বা বিজ্ঞান শব্দটি কারণ এরা সব 'না-বিজ্ঞান'। পুস্তকটির প্রকরণগত উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছেন মাত্র একটি বাক্যে—'দেশে দেশে বিজ্ঞান-ধর্ম দ্বৈরথের ইতিহাস অতি বিচিত্র, অতীব মনোমুগ্ধকর ও অত্যন্ত শিক্ষাপ্রদ'। আলোচ্য পুস্তকটি বিজ্ঞান প্রগতির ইতিহাস শুধুমাত্র রাষ্ট্রের (আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র) এবং অতি স্বল্প সময়ের বিস্তারে (১৭০০-২০০০)। এর সাথে সমান্তরাল চলেছে না-বিজ্ঞানের চলন। আশীষ লাহিড়ীর বিজ্ঞানের ইতিহাস সংক্রান্ত অনেকগুলি পুস্তকের সম্ভবত সর্বশেষ সংযোজন এই বইটি, যেখানে বিজ্ঞান-প্রযুক্তিতে আমেরিকার অসামান্য সাফল্যের পরেও যে সমস্ত বহু প্রশ্নের উত্তর অধরাই থেকে যায় তা নিয়ে। লেখক বলছেন '...অবাক করা প্রশ্ন এই যে এত সবের পরেও আমেরিকার জনচেতনায় বিজ্ঞানের পরিস্রাবণ এত ক্ষীণ কেন?' অনেক উদাহরণ দিয়ে এই বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করার পরে তাঁর মন্তব্যটি '...ধর্মীয় স্থিতাবস্থার সঙ্গে রাজনৈতিক স্থিতাবস্থার সম্পর্ক এতই অঙ্গাঙ্গী যে সেটা বজায় রাখার জন্য বিজ্ঞান-চেতনা বিসর্জন দিতে তাদের বাধে না।' লেখক বলছেন, 'এই অদ্ভুত প্রহেলিকার—না, সমাধান নয়—চরিত্র নিরূপণই এই বইয়ের অন্বিষ্ঠ'।

১৭০০ থেকে ২০০০ সালের মধ্যে আমেরিকার বিজ্ঞান-সাফল্যর ইতিহাস এবং তার সাথে অপবিজ্ঞানের যাত্রাপথ দুটোই ধরা আছে এখানে। লেখক বলছেন, '...১৯২৯-এর মহামন্দা এসে আমেরিকার নিরবচ্ছিন্ন সমৃদ্ধির সুখস্বপ্ন চুরমার করে দিল। আর ওই সময়েই মাথা চাড়া দিল নিউ এজ আন্দোলন'। ফলত, অপবিজ্ঞানের অসংখ্য উপশাখার সৃষ্টি হল বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে। নাম এবং উপনামে ভরপুর এই অবিজ্ঞান বা অপবিজ্ঞানের শাখা। কয়েকটি প্রধান নাম (বা বিষয়) জ্যোতিষশাস্ত্র, অ্যালকেমি, অতীন্দ্রিয় উপলব্ধি, অবতার-বাদ, যাদুবিদ্যা, প্রেত-তত্ত্ব, জন্মান্তরবাদ ইত্যাদি। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে এর রূপেরও পরিবর্তন ঘটেছে। জন্ম নিয়েছে গ্রহান্তরের আগন্তুক এবং এর সাথে অ-শনাক্ত উড়ন্ত যান (Unidentified Flying Object)। এসেছে অবতারের পশ্চাতে জ্যোতির্বলয়, আত্মার ছবি, অতীন্দ্রিয় উপলব্ধিজাত বিবিধ কার্যকলাপ, চুম্বক ব্যবহার করে রোগ নিরাময়, চিকিৎসা শাস্ত্র অনুমোদন করে না এরকম চিকিৎসা পদ্ধতি, এসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিজ্ঞান অসমর্থিত তত্ত্বাবলী— যেমন মনস্তাত্ত্বিক শক্তি (psychic power), মানব শক্তি বলক্ষেত্র (Human energy field) এই সব। অর্থাৎ, গত শতাব্দী থেকে কুসংস্কার এবং অপবিজ্ঞানের ওপর বিজ্ঞানের আচ্ছাদন দেওয়ার চেষ্টা শুরু হল। পরাবিজ্ঞানের বিজ্ঞান স্বীকৃতির প্রয়াস অল্পস্বল্প চেষ্টা অনেক আগে থেকে শুরু হলেও, পরাবিজ্ঞানকে বিজ্ঞানের সুন্দর নতুন জামা পরাবার কৃতিত্ব পাবেন মার্কিন উদ্ভিদ বিজ্ঞানী জে বি রাইন। তিনি তাঁর কর্মস্থল, ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়ের (Duke University) পরামনস্তত্ত্ব বিভাগটি প্রতিষ্ঠা করেন মনস্তত্ত্ব বিভাগের শাখা হিসেবে (১৯৩০)। কিছু শব্দবন্ধ যেমন অতীন্দ্রিয় উপলব্ধি, সাইকোকাইনেসিস (মনঃসংযোগ প্রয়োগ করে কোনো জড় বস্তুকে স্থানচ্যুত করা) ইত্যাদির সৃষ্টিকর্তা রাইন (১৯৩০-এর দশক)। কিন্তু তারও আগে, ১৯১১ সালেই স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে এই সব পঠন-পাঠন এবং গবেষণা শুরু হয়। ১৯৫৭ সালে নর্থ ক্যারোলিনাতে প্রতিষ্ঠিত হয় প্যারা সাইকোলজি অ্যাসোসিয়েশন। ১৯৬৯ সালে প্যারা সাইকোলজি অ্যাসোসিয়েশন (সংক্ষেপে PA) যুক্ত হয়ে গেল বিখ্যাত এবং সম্মানিত আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি অ্যাডভান্সমেন্ট অফ সায়েন্স (সংক্ষেপে AAAS)-এর সঙ্গে। এই সমস্ত ব্যাপার-স্যাপারের উৎস সন্ধানে নিয়ে গেলেন শ্রী

লাহিড়ী। আলোচ্য বইটিতে তিনি আমাদের জানালেন যাজক জোগানের লক্ষ্যে কি ভাবে জন্ম নিল বিখ্যাত হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়। এই হার্ভার্ডেই আমেরিকা মহাদেশে আধুনিক বিজ্ঞানচর্চার প্রথম অঙ্কুরটিও উদ্ভিন্ন হল। হার্ভার্ডের উত্তরণের কাহিনি আমেরিকার বিজ্ঞানের এবং না-বিজ্ঞানের চরিত্র বুঝতে সাহায্য করে। এই আলোচনাক্রমেই আমরা বুঝতে পারি কি ভাবে 'ধর্মীয় সত্য, ঈশ্বরের অস্তিত্ব কিংবা আত্মার অবিনশ্বরতা প্রভৃতির ব্যাখ্যায় তথাকথিত দৈবী প্রত্যাদেশের বদলে যুক্তিভিত্তিক আলোচনা শুরু হল। গড়ে উঠল এক ধরনের বিজ্ঞান-ধর্ম সহাবস্থানের কৃষ্টি'। এই পথ ধরে এগিয়ে গিয়ে পরাবিজ্ঞানের দলটি এক মোক্ষম চাল চালল। বিশ্বের সর্বোচ্চ সম্মানধারী নেচার পত্রিকার ১৮ অক্টোবর, ১৯৭৪ সংখ্যায় প্রকাশিত হল গবেষণা পত্র, 'Investigating the Paranormal'; গবেষক দুজন, রাসেল টার্গ (Russel Targ) এবং হ্যারল্ড পুটহফ্ (Harold Puthoff), ক্যালিফোর্নিয়ার স্ট্যানফোর্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউটের, ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড বায়ো-ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের গবেষক-অধ্যাপক। এই অভূতপূর্ব ঘটনার কারণ আজও জানা যায় নি। বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রচলিত নিয়মের বাইরে গিয়ে নেচার সম্পাদকের আত্মসাফাই, Publishing in a scientific journal is not a process of approval from establishment.'

ইউনেস্কা একটি বহুল পঠিত পত্রিকা প্রকাশ করে— Impact of Science on Society. এই নামজাদা পত্রিকাটির একটি সংখ্যা (Volume XXIV, No.4, October-December 1974) শুধুমাত্র পরাবিজ্ঞান বিশেষ সংখ্যা হয়ে প্রকাশিত হল। পরাবিজ্ঞানের ন'টি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের ওপর, বিজ্ঞান গবেষণা পত্রের আদলে লেখা ন'টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হল। মুখবন্ধ লিখলেন বিখ্যাত এবং বহু পঠিত Darkness at Noon উপন্যাসের রচয়িতা আর্থার কোয়েস্টলার। আর্থার কোয়েস্টলার মৃত্যুর আগে দানপত্র করে ৫ লক্ষ পাউন্ড ইংল্যান্ডের যে কোনো একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরাবিজ্ঞান শাখা খোলার জন্য রেখে গিয়েছিলেন। কেম্ব্রিজ এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাদের নিজ নিজ সুনাম হানির সম্ভাবনায় এই প্রস্তাব ফিরিয়ে দেয়। এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় এই অর্থ গ্রহণ করে পরাবিজ্ঞান-পরামনস্তত্ত্ব বিষয়ে পদ সৃষ্টি করে ইংল্যান্ডের শিক্ষা জগতে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। অর্থাৎ, ধাপে ধাপে অপবিজ্ঞান জাতে ওঠার চেষ্টা করে চলল। এর সঙ্গে প্রচারমাধ্যমকেও তারা কাজে লাগাল। ভারতেও ঐ সময় বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় অতীন্দ্রিয়বাদ নিয়ে প্রচুর লেখালেখি হত। খ্যাতনামা আইরিশ সাংবাদিক ব্রায়ান ইন্‌গ্লিশ (Brian Inglish)-এর দু'কিস্তির বিশাল সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছিল The Statesman পত্রিকার ১৯৮৪ সালের ২৫-২৬ মার্চ। শিরোনাম The Eye of the Mind -I &II: 50 Years of Extra-Sensory Perception.

(প্রসঙ্গক্রমে এই সময়কালে দুটি কুসংস্কার-অপবিজ্ঞান বিরোধী পত্রিকা প্রকাশের সূচনা হয়েছিল। আমেরিকা থেকে প্রকাশিত হল 'Sceptical Inquirer' ১৯৭৬ সালে, ভারতবর্ষ থেকে প্রকাশিত হল 'উৎস মানুষ' ১৯৮০ সালে। দুটি পত্রিকাই আজও প্রকাশিত হয়ে চলেছে।)

আশীষ লাহিড়ী পরম যত্নে এবং নিষ্ঠায় দুটি গবেষণাধর্মী পরিচ্ছেদ উপহার দিয়েছেন নিউ এজ আন্দোলন সম্পর্কে। অধিকাংশ তথ্যই হয় অজানা অথবা কম জানা। শুধু তথ্য দিয়েই দায় সারেন নি তিনি, তাঁর মূল্যবান বিশ্লেষণও আমাদের ঋদ্ধ করে। এক স্থানে তিনি বলেছেন, 'বিশ শতকের মাঝ-সত্তর থেকে আমেরিকায় জ্যোতিষ, পূর্বজ্ঞান, চ্যানেলিং, ভবিষ্য-দর্শন, দূর-সঞ্চালন, ক্রিয়েশনিজম এবং এদের হরেক জ্ঞাতিকুটুম্ব বিজ্ঞান পদবাচ্য হয়ে ওঠার দাবি জানাতে থাকে'। সাংবাদিক ভালহাউলি মন্তব্য করেছেন, যে কোনও রকম বিচার বিশ্লেষণ যুক্তি ছাড়াই কোনও ঘটনাকে সরাসরি বিশ্বাস করার জন্মগত প্রবণতা আছে মানুষের। এই প্রবৃত্তিটাই বাস্তবে অপবিজ্ঞানের উর্বর জন্ম ক্ষেত্র। এখান থেকেই জন্ম নেয় জ্যোতিষশাস্ত্র, অতীন্দ্রিয় কাণ্ডকারখানা, হস্তরেখা বিচার, প্ল্যানচেট, জন্মান্তরবাদ, গ্রহান্তরের আগন্তুক অথবা বর্তমানের লাফিং বুদ্ধ, ফেঙ সুই (feng shui), বাস্তুশাস্ত্র ইত্যাদির। এই সব যুক্তিহীন বিশ্বাস সমাজের ওপর আরও চেপে বসে, যখন সমাজের বিখ্যাত এবং প্রভাবশালীরা এই সব ধারণার স্বপক্ষে আচরণ করেন। ভুলে যান যে তাদের এই আচরণ সমাজের ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলতে সক্ষম। প্রাক্তন মার্কিন রাষ্ট্রপতির স্ত্রী ন্যান্সি রেগান আত্মজীবনীতে অকপটে জানিয়েছেন তাঁর বিশ্বাসের কথা। তিনি লিখেছেন যে, তিনি একজন পরাবিজ্ঞান কারবারিকে নিযুক্ত করে ছিলেন সাত বছর ধরে রেগানের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মিটিংয়ের দিনক্ষণ নির্ধারণের জন্য। হিলারি ক্লিন্টনের স্বীকারোক্তি আরও চমকপ্রদ। তিনি নাকি বিখ্যাত নব্যগুরু জ্যঁ হাউস্টন (Jean Houston)-এর পরামর্শে এবং সহায়তায় প্রয়াত রুজভেল্টের আত্মার সঙ্গে সংলাপে রত হয়েছিলেন। আমেরিকার বিজ্ঞান-না-বিজ্ঞান রসায়নে সবই সম্ভব।

বিখ্যাত মার্কিন পত্রিকা স্কেপটিক্যাল এনকোয়ারার

(Sceptical Enquirer)। এই পত্রিকা অন্যতম সম্পাদক, এমোরি বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্তত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক, স্কট লিলিএনফেল্ড (Scot Lilienfeld), অধুনা অলৌকিকতার বৈপ্লবিক প্রসারের জন্য দায়ী দুটি প্রধান কারণের উল্লেখ করেছেন। (১) বিজ্ঞান দুনিয়ায় ইন্টারনেটের মাধ্যমে তথ্য এবং অপতথ্যর বিস্ফোরণ এবং (২) অতি নিম্নমানের বিজ্ঞান চেতনা বা বিজ্ঞান স্বাক্ষরতা। তিনি একটি উদাহরণ দিয়েছেন। তাঁরই করা একটি জনসমীক্ষায় দেখা গেছে, 'মাত্র ৭ শতাংশ মার্কিন জনগণ ডি এন এ বা অণু সম্পর্কে ন্যূনতম ধারণা রাখেন— বাকিরা অন্ধকারে। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই অধ্যাপক মনে করেন, 'বিজ্ঞান চেতনার অভাবেই পরাবিজ্ঞানের আপাত চমক সৃষ্টিকারী ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য হয়ে যায়।'

অধ্যাপক লিলিয়েনফেল্ড আরেকটি প্রাথমিক কারণের কথা জানিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য অনুসারে, মানুষের চেতনার ক্ষমতা (cognitive ability) মানুষের মস্তিষ্কে এক বিশেষ ক্ষমতার সঞ্চার করেছে। সে কাল্পনিক জগত সৃষ্টি করতে সক্ষম। এর ফলেই মানুষ গল্প বা নানা ধরনের শিল্পকলায় উৎসাহিত হয়। বাস্তব, পরাবাস্তব বা অমূর্ত যে কোনও রকম কাল্পনিক জগত মানুষের কাছে উন্মুক্ত। এই বিশেষ ক্ষমতা, cognitive ability, মানুষের মস্তিষ্কে জোরালোভাবে উপস্থিত। মানুষ এই জগতে যেতে পছন্দ করে। কাল্পনিক জগত যুক্তিপূর্ণভাবে বিন্যস্ত হবে যদি সেই মানুষ বিজ্ঞানমনস্ক বা সাধারণ অর্থে যুক্তিবাদী হন। লিলিয়েনফেল্ড আরও বলেছেন, 'মানসিক চিত্রকল্প রচনায় পারদর্শী হওয়ার সুবাদেই তাঁরা চাঁদের বা মঙ্গলের গায়ে মানুষের মুখের আদল খুঁজে পায়।' মনস্তত্ত্বের অধ্যাপক জেফ্রি শ্যালার (Jeffrey Schaler) বলছেন, 'বিজ্ঞান চেতনা যখন বিশ্বাসে আঘাত করে, তখন মানুষ বিজ্ঞানকে সরিয়ে রেখে অলৌকিকতাকেই মদত দিয়ে বাড়িয়ে তোলে। এটাই তাদের ব্যক্তিত্বের স্বার্থে বেশি নিরাপদ।'

এই পর্যন্ত আমরা মনস্তাত্ত্বিক বিশেষজ্ঞদের কথা শুনলাম। এবারে শারীরতত্ত্ববিদ কি বলেন শোনা যাক। ১৯৮৩ সালে 'শারীরবিদ্যা ও চিকিৎসা' বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পান বিজ্ঞানী রিটা লেভি মন্তালশিনি (Rita Levi-Montalcini)। জগত-বিখ্যাত এই মস্তিষ্ক বিশেষজ্ঞ তাঁর শততম জন্মদিনে একটি দীর্ঘ সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, 'আমাদের মস্তিষ্ক দুটি গোলার্ধে বিভক্ত। একটি অংশ প্রাচীন বা সেকেলে (archiac) যা আমাদের আবেগ আর সহজাত প্রবৃত্তিগুলো (Instinct) নিয়ন্ত্রণ করে। অন্য গোলার্ধের অংশটি তুলনায় নবীন। এটি আমাদের যুক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে। বর্তমান বিশ্বে প্রাচীন অংশটি প্রাধান্য বিস্তার করেছে। বর্তমান বিশ্বের যাবতীয় বিয়োগান্তক, বেদনাত্মক এবং গণহত্যা (holocaust) সংঘটিত হওয়ার ঘটনার জন্য এটি দায়ী। মানবতার অন্তিম শয্যা রচনা করেছে এই অংশটি। এই অংশটি যেমন আমাদের গাছের ডাল থেকে নামিয়ে আনতে পেরেছে ঠিক তেমনি আত্মধ্বংসের বীজও বপন করেছে। সমগ্র মানুষ জাতিকেই বিলুপ্তির পথে নিয়ে চলেছে। শেষটা যেন দেখাই যাচ্ছে।' এই প্রাচীন মস্তিষ্কটিই অলৌকিক ঘটনা, পরাবিজ্ঞান, অপবিজ্ঞান বা অবিজ্ঞানে মানুষের বিশ্বাস উৎপাদন করেছে যেমন করেছে মৌলবাদ, ধর্ম-বর্ণ-জাতি ইত্যাদি নিয়ে লড়াই, যার চূড়ান্ত প্রকাশ দেখা গেছে হিটলারের জার্মানিতে। পরাবিজ্ঞান এবং মৌলবাদ দু-এর উৎসই এক, প্রাচীন মস্তিষ্কের অতি সক্রিয়তা এবং নবীন মস্তিষ্কের অসহায়তা।

আশীষ লাহিড়ী একটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি দেখেছেন। অপবিজ্ঞানের সীমাহীন বাড়বাড়ন্তর জন্য তিনি বেশ কয়েকটি কারণ বিভিন্ন উৎস থেকে সংগ্রহ করেছেন। যেমন, '...চরম ধর্মীয় গোঁড়ামি একটা রাজনৈতিক শক্তি হয়ে ওঠার ঘটনা...', '...সমাজের প্রভুত্বকারী মতাদর্শগুলির প্রাকৃতিক পরিঘটনাগুলি নিয়ে তদন্তের সুর বেঁধে দেয়া', 'সমাজ থেকে বিজ্ঞানকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার প্রক্রিয়া অবলম্বন করা' ইত্যাদি।

সহজবোধ্য আলোচনার মধ্য দিয়ে বইটিতে অনেক প্রাসঙ্গিক গভীর বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে। বর্তমানের এই দুঃসময়ে এমন একটি অতি প্রয়োজনীয় গ্রন্থ সমস্ত বিজ্ঞান আন্দোলন কর্মী এবং বিজ্ঞানপ্রেমীদের অবশ্য পাঠ্য হবার দাবি রাখে। গল্প-উপন্যাস-কবিতা নয়, বইটিতে লেখক আমাদের প্রায় অজানা বা কম জানা বিষয়, তাও আবার বহু দূরের দেশের সামাজিক পরিস্থিতি নিয়ে কাটাছেঁড়া করেছেন। এমন বিষয় নিয়ে বই যার বাণিজ্যিক সাফল্যের দিকটা নিয়ে যে কোনো প্রকাশক দশ বার ভাববেন, এই বইটির ক্ষেত্রে প্রকাশক সেদিকটা ততটা ভেবেছেন বলে মনে হল না। বইয়ের দাম সাধারণ পাঠকের নাগালের ভেতর রাখা হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রকাশক সামাজিক দায়িত্ব নিয়ে বেশ সচেতন ছিলেন তার জন্য ধন্যবাদ প্রাপ্য।

শংকর ঘটক

উমা

উৎস মানুষ WB/EC 228 ISSN 0971-5800 RN. 37375/80 Rs. 30.00

৪৪তম বর্ষ ২য় সংখ্যা এপ্রিল-জুন ২০২৪ ৩০.০০ টাকা

উৎস মানুষ পত্রিকা ও প্রকাশনার বইয়ের জন্য যোগাযোগ— সুমন্ত বিশ্বাস।
ফোন— ৯৪৩৩৭৭১৫৭৭/৯১৪৩৭৮৬১৩৪

উৎস মানুষ পত্রিকা ও প্রকাশনার বইগুলি অনলাইনে অর্ডার দিলে পাওয়া যায়। যোগাযোগ—হারিত বুকস (অনলাইন) **haritbooks@gmail.com**
হারিতের ফোন নং — +৯১ ৮৩৩৬৯৪১১০৮

গ্রাহক চাঁদা (বাৎসরিক) ১৫০ টাকা (চারটি সংখ্যার জন্য) উৎস মানুষের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা দেওয়া যায়। স্পিড পোস্টে নিলে ২২০ টাকা জমা দিতে হবে।

Punjab National Bank,
College Street Branch,
Kolkata - 700073.
UTSA MANUSH, SB ACCOUNT NO. 0083010748838. IFSC NO. PUNB0058400

বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়া যায়। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা জমা দিয়ে ফোনে বা ই-মেলে নাম, ঠিকানা, পিনকোড, ফোন নং ও ই-মেল দেবেন আর কোন সংখ্যা থেকে গ্রাহক হবেন তা জানাবেন। সাধারণ ডাকে পত্রিকা পাঠানো হয়। ডাকে পত্রিকা না পেলে আমরা সংখ্যাটি দ্বিতীয়বার পাঠাতে পারব না। গ্রাহক নবীকরণ একইভাবে করা করা হয়।

ওয়েবসাইট : https://www.utsomanush.com
ই-মেল : utsamanush1980@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/

পুস্তক তালিকা

জল-জমি-জঙ্গলের খোঁজে:	
বোলান গঙ্গোপাধ্যায়	১৫০.০০
স্বাস্থ্যের সাতকাহন : গৌতম মিস্ত্রী	(১ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)
আসুন কাণ্ডজ্ঞানে ফিরি: আশীষ লাহিড়ী	৮০.০০
চেনা বিষয় অচেনা জগৎ: সমীরকুমার ঘোষ	১৫০.০০
বাঁধ বন্যা বিপর্যয় (সংকলন)	২০০.০০
আহরণ (সংকলন)	২০০.০০
যে গল্পের শেষ নেই: দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	১৫০.০০
প্রতিরোধ : সম্পা: (ঐ)	১০০.০০
বিজ্ঞান অবিজ্ঞান অপবিজ্ঞান (সংকলন)	২০০.০০
বিজ্ঞান জ্যোতিষ সমাজ (সংকলন)	১৫০.০০
বিবেকানন্দ অন্য চোখে/সমীক্ষা ও আরো কিছু বিতর্ক	
নিরঞ্জন ধর	১২০.০০
প্রমিথিউসের পথে (সংকলন)	৫০.০০
লেখালিখি: অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়	২০০.০০
যুক্তিবাদের চার সেনাপতি	
অনু : প্রতুল মুখোপাধ্যায়	৬০.০০
শেকল ভাঙা সংস্কৃতি (সংকলন)	১২০.০০
গুমোট ভাঙ্গার গান: ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ	১৫০.০০
নিজের মুখোমুখি: রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য	৫০.০০
এটা কী ওটা কেন (সংকলন)	৫০.০০
মূল্যবোধ (সংকলন)	৮০.০০
প্রেসিডেন্ট বুশ-এর এই যুদ্ধ:	
অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়	৩০.০০
বাংলা বন্ধ বা শেষের শুরু:	
হিমানীশ গোস্বামী	৪০.০০

প্রাপ্তিস্থান : পাতিরাম, সেতু প্রকাশনী, ২ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, অমর কোলে (বিবাদী বাগ), সুনীল কর (উল্টোডাঙা), কল্যাণ ঘোষ (রাসবিহারী মোড়), মনীষা গ্রন্থালয় (কলেজ স্ট্রীট), ক্রান্তিক (কলেজ স্ট্রীট), রথীনদা (গোলপার্ক). ন্যাশনাল বুক এজেন্সি (সূর্য সেন স্ট্রীট) । জ্ঞান বিচিত্রা ১৮বি/১বি, টেমার লেন। প্রতিক্ষণ, ৫ সূর্য সেন স্ট্রীট।
হারিত বুকস (অনলাইন) **haritbooks@gmail.com**

উৎস মানুষ সোসাইটির পক্ষে বরুণ ভট্টাচার্য কর্তৃক বি ডি ৪৯৪, সল্টলেক, কলকাতা- ৭০০ ০৬৪ থেকে প্রকাশিত এবং দি নিউ জয়কালী প্রেস, ৮এ, দীনবন্ধু লেন, কলকাতা- ৭০০ ০০৬ হইতে মুদ্রিত।